নজরুল-জন্মজয়ন্তী

বাংলা একাডেমী : ঢাকা
বাংলা একাডেমী : ঢাকা

২৫ মে, ১৯৭২

বাএ ৯৮৭

পাণ্ডুলিপি : অনুবাদ বিভাগ,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

সূচীপত্র

সূচনা

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম একাত্তর বয়সে পদার্পণ করিবেন আগামী ২৫শে মে। ঐদিন তাঁহার সত্তরতম জন্ম-জয়ন্তী জাতীয় উৎসব হিসাবে পালিত হইবে। ঐ পুণ্য উৎসবের স্মারক-চিহ্ন হিসাবে এই পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রবলের অন্যায় অত্যাচার, সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে ক্লিষ্ট মানুষের প্রতি গভীর মমতাবোধই বাগিচায়-বুলবুলের গানে মুগ্ধ তরুণ নজরুলের কবিসত্তায় বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ জাগাইয়া দিয়াছিল। তাঁহার 'অগ্নিবীণা'য় ঝংকারিত হইয়া উঠিয়াছিল দৃপ্ত-দীপক রাগিণী এবং হাতের বাঁকা বাঁশের বাশরীর সুর রূপান্তরিত হইয়াছিল রণতূর্যে।

নিপীড়িত মানুষের পক্ষ হইতে 'খেয়ালি বিধির বক্ষ ভিন্ন' কবিতায় শপথমুখর কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হইল "পীড়িত মানব পারে নাকো, আর সবে না এ অপমান"।

জাতির দুর্ভাগ্য, সে কণ্ঠ আজ বাক্যহারা। উজ্জ্বল যে দুইটি চক্ষু সৃষ্টিকে সুন্দর ও সাম্যের দৃষ্টিতে দেখিয়াছিল—আজ সেই চক্ষু দুইটিতে বোবার চাহনি।

কবিকণ্ঠে যে বিদ্রোহের বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিরুদ্ধে কবির বীণাতে যে সাম্যের গান ঝংকৃত হইয়া উঠিয়াছিল, এই জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে তাহাই দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করুক। কবির প্রতি আমাদের এই শ্রদ্ধা নিবেদন ইহাতেই সার্থকতা লাভ করিবে।

সত্যপ্রিয় রায়
শিক্ষামন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ
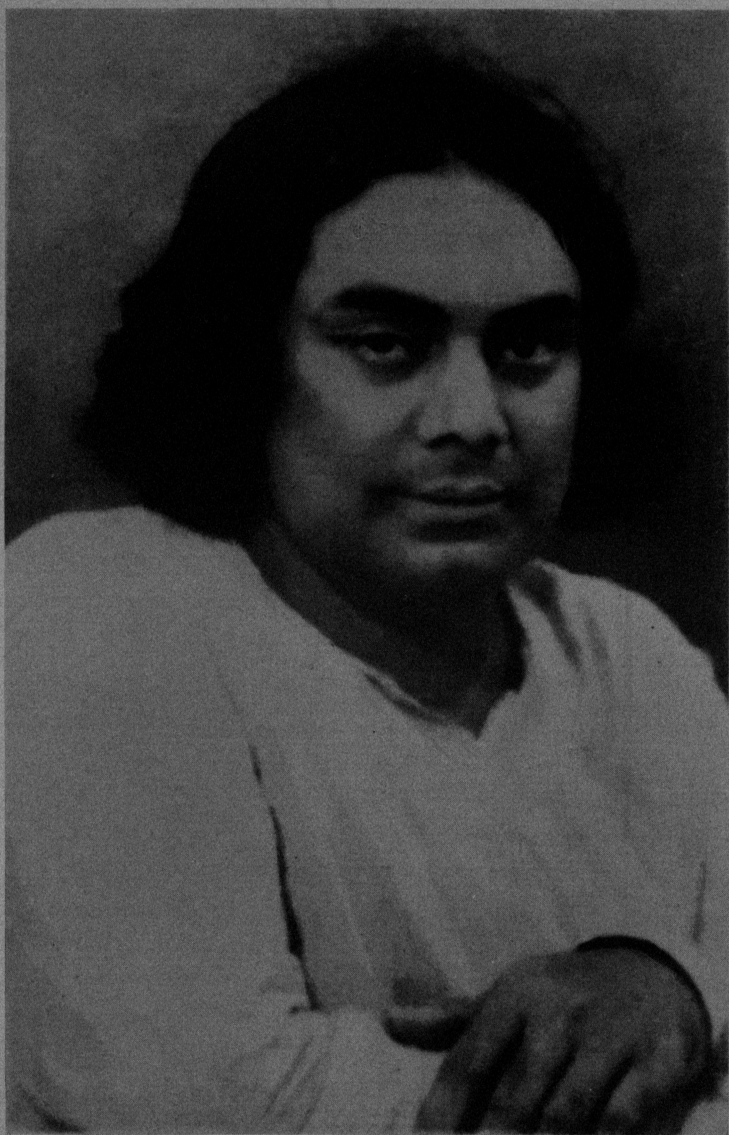
আমি চির-বিদ্রোহী বীর—
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির।

কবি-প্রশস্তি

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সপ্ততিতম বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে—

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের বয়স সত্তর বছর পূর্ণ হওয়ায় সারা দেশের মানুষের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার গভীর আনন্দ প্রকাশ করছে এবং বেদনার সঙ্গে স্মরণ করছে যে, দুরারোগ্য ব্যাধিতে বোধ ও বাক্‌শক্তিহীন কবিকে আজ এ কথা জানাবার কোন উপায় নেই তিনি আমাদের কত আদরের, কত শ্রদ্ধার এবং কত গৌরবের।

বৃটিশ শাসিত ভারতে পরাধীনতার লাঞ্ছনা এবং দারিদ্র্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে তিনি কিশোর বয়সেই দেশপ্রেমের আহ্বানে সাড়া দেন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সশস্ত্র সৈনিক হওয়ার প্রবল আগ্রহে তিনি উজ্জ্বল সম্ভাবনাপূর্ণ ছাত্রজীবন ত্যাগ করে সৈনিকের জীবন গ্রহণ করেন।

এই সৈনিকজীবন থেকে তিনি যখন বাংলা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হলেন, তখন তাঁর কাব্যের মোহনবাঁশি অনতিবিলম্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষুরধার অসিরূপে আত্মপ্রকাশ করল। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত জাতি একবাক্যে তাঁকে বিদ্রোহী কবিরূপে বরণ করে নিল।

অত্যাচারী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাঁর লেখনীকে বারবার স্তব্ধ করার চেষ্টা করেছে, তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু অত্যাচারের শাণিত কৃপাণ কখনো তাঁকে ক্লান্ত ও শান্ত করতে পারে নি। শিকল পরেই তিনি শিকল ভাঙার এবং কারাগারের লৌহকপাট লোপাট করার গান গেয়েছেন। পরাধীন ভারতের দুরন্ত যৌবনের গীতিকার কবি বর্তমান ও ভবিষ্যতের যুবচিত্তকে রক্ত-রাঙা প্রভাতের আশায় অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

সেই যুগে সাম্রাজ্যবাদী সন্ত্রাসের ফলে দেশের অধিকাংশ শিল্পী-সাহিত্যিক বিশুদ্ধ শিল্প অথবা ধনতান্ত্রিক ইউরোপের অবক্ষয়বাদী ও পলায়নী মনোবৃত্তিসম্পন্ন শিল্প-চর্চায় মগ্ন ছিলেন। এই সময় বিদ্রোহী কবি নজরুলের কাব্য কেবল স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রসর হওয়ার শঙ্খ-নিনাদে নিবৃত্ত হয় নি—ইউরোপের পূর্ব প্রান্তে যে নূতন সমাজ সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল—তাকে স্বাগত জানিয়ে তার জয়ধ্বনি করে তিনি বিশ্ব-

শ্রমিক মৈত্রীর রণধ্বনি 'আন্তর্জাতিক' সংগীতের অনুবাদ এবং 'সাম্যবাদী' কবিতা রচনা করে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রবাদী ভাবধারা প্রচারে অন্যতম পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

কবির সংগ্রামী ভাবাদর্শ বাংলাসাহিত্যে প্রকাশ করার জন্য বাংলা ভাষাকেও তিনি নূতন সম্পদে ভূষিত করেছেন, নিত্য নতুন শব্দ চয়ন করে এবং ছন্দ ও সুরের বৈচিত্র্য ঘটিয়ে বাংলার ললিত গীতিকাব্যকে রণক্ষেত্রের তূর্যধ্বনিতে পরিণত করেছেন। এইভাবে কাব্যে ও সংগীতে তিনি যে গতিশীলতা সৃষ্টি করেছেন তা বাংলা সাহিত্য ও ভাষার ইতিহাসে নূতন যুগের সূচনা করেছে।

বৃটিশ শাসনের যে অধ্যায়ে কবির আবির্ভাব—সেই অধ্যায়ে ধর্মীয় এবং মধ্যযুগীয় কু-সংস্কারের সুযোগ নিয়ে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল চক্র দেশের মধ্যে বিভেদের ষড়যন্ত্র করে। কবি নজরুল ইসলাম কেবল লেখনী দিয়ে নয়---নিজের জীবন দিয়ে এই বিভেদের বিরুদ্ধে এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পক্ষে সংগ্রাম করেছেন। আজ যখন রাষ্ট্রীয় কারণে বাঙালী জাতি খণ্ডিত, তখন তিনি আমাদের মধ্যে এমনি একটি জীবন্ত সেতু—যার সাহায্যে দুই রাষ্ট্রের অধিবাসী বাঙালী মুহূর্তে নিজেদের এক ও অভিন্ন বলে ভাবতে দ্বিধাবোধ করে না।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম চিরযৌবনের প্রতীক, উন্নততর জীবনের জন্য ঐক্য ও সংগ্রামের প্রতীক। আজকের এই পুণ্য দিনে আমাদের দেশবাসীর সঙ্গে আমরা প্রার্থনা করি—অনির্বাণ দীপশিখার মত তিনি আমাদের চিত্তকে আলোকিত করুন এবং মানব-মুক্তির মহত্তম সাধনায় আমাদের চিরন্তন প্রেরণা হয়ে থাকুন। ইতি—
২৫শে মে, '৬৯

গুণমুগ্ধ দেশবাসীর পক্ষে
পশ্চিমবঙ্গ যুক্তফ্রন্ট সরকার

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ আমাদের কর্তব্য

মুজফ্ফর আহ্মেদ

বাঙলার মানুষের অতি প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইস্লাম আজ সত্তর বছর বয়স পুরো করে একাত্তরে পা বাড়ালেন। আজকার দিনে আমরা কবিকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই।

আজ হতে উনপঞ্চাশ বছর আগে, ১৯২০ সালের মার্চ মাসে যাঁরা কলকাতায় ছিলেন,—যাঁদেরই তখন যাতায়াত ছিল ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীটের দোতলায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির আফিসে, তাঁরা সেদিন নিশ্চয় লক্ষ্য করেছিলেন কি ভাবে সে বাড়িতে কাজী নজরুল ইসলাম সশব্দে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর ছাত্র জীবনের বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁকে পৌঁছিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন।

করাচিতে একটি অস্থায়ী সৈন্যদলের অবস্থান ছিল, তার নাম ছিল 'উনপঞ্চাশ নম্বর বেঙ্গলী ব্যাটালিয়ন'। তাতে নজরুল ইস্লাম কোয়ার্টার্স মাস্টার হাবিলদারের পদে উঠেছিল। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে যখন এই সৈন্যদলটি পুরোপুরি ভেঙে গেল তখন হল নজরুল ইস্লামের কলকাতা আগমন। আসতে-না-আসতেই তাঁর বন্ধুদল জুটে গেল। কারণে-অকারণে তিনি উচ্চরোলে হাসেন, চেঁচিয়ে তিনি বাড়ি-ঘর মাতিয়ে তোলেন, আর নবলব্ধ বন্ধুরা গান গাইতে বললে গান তিনি গেয়েই চলেন, তার শতকরা নিরানব্বুই ভাগই রবীন্দ্রনাথের গান। নজরুল ইস্লাম কারুর বাড়িতে গেলে পাশের বাড়ির লোকেরা টের পেয়ে যান যে ও-বাড়িতে নজরুল ইস্লাম এসেছেন।

এই সদা প্রাণচঞ্চল যুবকটি কবিতা লেখা আরম্ভ করলেন। কয়েকটি কবিতা তাঁর মাসিক-পত্রে ছাপাও হলো। আমরা কিছু বুঝতে-না-বুঝতেই এক রকম রাতারাতি কবি প্রসিদ্ধি লাভ করলেন তিনি। বাঙলা দেশে জয়-জয়কার হলো তরুণ কবি নজরুল ইসলামের। সব চেয়ে বড়ো আশ্চর্যের বিষয় এই যে রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত এক কবির লেখা রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত।

নজরুল ইস্লাম শুধু নিজেকে বুদ্ধিজীবী মহলে আটকে রাখলেন

না। তাঁর যাতায়াত শুরু হলো সাধারণ মানুষের ভিতরেও,—মজুরের ভিতরে ও কৃষকের ভিতরে।

নজরুল ইস্‌লাম শুধু কবিতাই লেখেন নি। নব নব অবদান তিনি দিয়েছেন, সুর ও সংগীতের জগৎকেও।

নজরুল ইস্‌লাম জীবনী শক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। একদিন তারও ভিতরে প্রবেশ করল ব্যাধি। এই ব্যাধি তাকে কুরে কুরে খেতে লাগল। অবশেষে ১৯৪২ সালের ৯ই জুলাই তারিখের রাত্রিতে তার ব্যাধি প্রকট হয়ে পড়ল 'অল-ইন্ডিয়া রেডিও'র কলকাতা স্টেশনে। তার পরে আমাদের সুপরিচিত নজরুল ইস্‌লামকে আমরা ধীরে ধীরে হারিয়েছি। তাঁর সম্বিৎ নেই, তিনি কথা বলতে পারেন না, তিনি আমাদের চিনতে পারেন না। কবি আজ জীবিত থাকলেও তাঁর অবস্থা মৃতের মতো।

কবি নজরুল ইস্‌লাম গত সাতাশ বছর যাবৎ অসুস্থ ও সম্বিতহারা। এই সাতাশ বছরে তিনি আমাদের কিছুই দিতে পারেন নি। কিন্তু সাহিত্য ও সংগীতের আসরে তিনি একসঙ্গে বাইশ বৎসর কর্মব্যস্ত জীবন কাটিয়েছেন। এই বাইশ বৎসরে তিনি আমাদের যে অবদান দিয়েছেন তার কোনো তুলনা হয় না। তার অবদান সমস্ত দেশের নিকট হতে স্বীকৃতি লাভ করেছে। নজরুল ইস্‌লাম দেশকে স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমের প্রেরণা জুগিয়েছেন। তিনি নিজেও ছিলেন দেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধের একজন সৈনিক। এইজন্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি কবির এই সুদীর্ঘ নীরবতা সত্ত্বেও তাঁর জনপ্রিয়তা প্রতি বৎসরই বেড়ে চলেছে।

ভারত ও পাকিস্তান,—এই দু'টি রাষ্ট্রের নিকট হতে কবি নজরুল ইস্‌লাম সাহিত্যিক বৃত্তি পান। এই রকম আর কেউ কোথাও পেয়েছেন কিনা তা আমার জানা নেই। গত ১৯৬৭ সালে পশ্চিম বাঙলায় যখন যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার কবির বৃত্তি মাসিক একশো টাকা বাড়িয়ে দিয়েছেন। আগে কবি পেতেন পূর্ব-পাকিস্তান সরকার ও কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের মিলিত বৃত্তি মাসিক ৩৫০ টাকা, আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারতের প্রধান মন্ত্রীর তহবিল হতে মিলিত বৃত্তি তিনি পেতেন মাসিক ৩০০ টাকা। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার মাসিক ১০০ টাকা বাড়িয়ে দেওয়ার পরে কবি এখন পান ভারত হতে মাসিক ৪০০ টাকা এবং পাকিস্তান হতে মাসিক ৩৫০ টাকা। সকশুদ্ধ কবি এখন পাচ্ছেন মাসিক ৭৫০ টাকার সাহিত্যিক বৃত্তি।

নজরুল ইস্‌লাম এখন থাকছেন তাঁর এখনকার বড়ো ছেলে কাজী

সব্যসাচীর সঙ্গে ক্রিস্টোফার রোডে কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের দুই কামরার একটি ছোট্টো ফ্লাটে।

সেবার কাজে কিছু শিক্ষা-পাওয়া অন্ততঃ দু'জন পরিচারক কবির জন্য প্রয়োজন। কবি প্রস্রাব কিছুতেই রুখতে পারেন না। তার জন্যে তাঁর কাপড় ভিজে যায়। কিন্তু কবিকে কিছুতেই ভিজা কাপড়ে থাকতে দেওয়া উচিত নয়। তাঁর যখন সুবিধা-অসুবিধার কথা প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই তখন আমাদেরই সবকিছু বুঝে নিতে হবে। কাপড় ভিজে গেলে সঙ্গে সঙ্গেই তা বদলে দিতে হবে। এক রকম রবারের পাউচ আছে সেটা কবিকে দিয়ে ব্যবহার করানো যাবে কিনা তা জানিনে। করাতে পারলে কাপড় ভিজে যাওয়ার সমস্যার খুব বেশীর ভাগ সমাধান হয়ে যাবে। আমার মনে হয় বছরে অন্তত দু'বার এক্সপার্ট সার্জন ও চিকিৎসকদের দিয়ে কবিকে পরীক্ষা করানো উচিত। এক্ষেত্রে সার্জন ও চিকিৎসকদের ফিস দেওয়ার কোনো কথা উঠবে না বলেই আমার ধারণা। অনুরোধ করলে অনেকেই খুশী হয়ে কবিকে দেখতে যাবেন। মামুলী অসুখ-বিসুখে চিকিৎসার ব্যবস্থা বোধ হয় আছে।

কবির বাসস্থানের সমস্যাটি বড় কঠোর ও পীড়াদায়ক। দুই কামরার ফ্লাটে কাজী সব্যসাচী তার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে সস্ত্রীক বাস করে। ছেলে-মেয়েরা ক্রমেই বড়ো হচ্ছে। আসলে দু'কামরায় সব্যসাচীদেরই স্থানের সংকুলান হওয়ার কথা নয়, অথচ এই স্থানটুকুর ভিতরে কবিকেও থাকতে হচ্ছে। তাঁর পরিচারকদেরও স্থানের সমস্যা আছে। কেউ যদি কবিকে দেখতে আসেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'মিনিট তাঁকে দেখে তাঁরা চলে যান। কবি তাঁর যে ছেলের সঙ্গেই থাকুন না কেন, (অনিরুদ্ধও বিবাহিত, তারও সন্তানেরা আছে) বাসস্থানের সমস্যাটি বাস্তব ও কঠোর। কমপক্ষে পাঁচটি কামরা তাঁদের জন্যে চাই। কবির পুত্রেরা চাইছে যে, রাষ্ট্র কবির জন্যে বাড়ী তৈয়ার করে দিন। কবির বাড়ী হোক এটা আমরা একান্ত ভাবেই চাই, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি কবির বাড়ী তৈয়ার করা স্থিরও করেন, তাতে খুব কম ক'রে সময় ধরলেও দু'বছর তো লাগবেই। ততদিন কবি কি বর্তমান দুঃসহ অবস্থার মধ্যেই কাটাবেন? ততদিন কি কবির দর্শকেরা দু'দশ মিনিট অপেক্ষা করার জন্যে এতটুকুও স্থান পাবেন না? আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি। তাঁরাই কলকাতায় সবচেয়ে বড় বাড়ীওয়ালা। ইচ্ছা করলেই তাঁরা কবির বাসস্থানের একটি ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

কবির লেখাগুলি সম্পর্কে এখন আমি কিছু বলতে চাই। তিনি তাঁর অনেক লেখার স্বত্ব বিক্রয় করে ফেলেছেন। তাঁর সুবিখ্যাত কবিতা পুস্তক "অগ্নিবীণা"র স্বত্ব তিনি বিক্রয় করেছেন, যতটা মনে রাখতে পারছি, ১৯৩১ সালে। যত পুস্তকের যত স্বত্ব তিনি বিক্রয় করেছেন সবই ১৯৪২ সালের আগে করেছেন। আমি আগেই বলেছি যে ১৯৪২ সালের ৯ই জুলাই তারিখে কবি তাঁর বর্তমান দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন। ধীরে ধীরে তাঁর লেখাগুলিতে বিকৃতি ঘটছে। যে-পুস্তকগুলির বিক্রয় কম সেগুলি আর ছাপাও হচ্ছে না। নজরুল ইস্‌লামকে একজন বড় কবি হিসাবে মেনে নিয়েছেন বলেই রাষ্ট্র তাঁকে সাহিত্যিক বৃত্তি দিচ্ছেন। এখন তাঁর লেখাগুলির সংস্করণ ও বিশুদ্ধি রক্ষণের ব্যাপারেও রাষ্ট্রকেই এগিয়ে আসতে হবে। যাঁরা স্বত্ব কিনেছেন তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। আমার বিশ্বাস ডি. এম. লাইব্রেরীর মালিক শ্রীগোপালদাস মজুমদারই স্বনামে ও বেনামে সর্বাপেক্ষা বেশী পুস্তক কিনেছেন। আরও কয়েকজন আছেন। আমার বিশ্বাস গভর্নমেণ্ট স্বত্ব কিনে নিতে চাইলে তাঁরা তা বিক্রয় করে দেবেন। অনেক লাভ তাঁরা করেছেন। তাছাড়া, তাঁরা বিক্রয় করবেন এই জন্যেও যে সরকার আইন রচনা করলে তখন তো তাঁদের স্বত্ব ছেড়ে দিতেই হবে। দলিল পড়ে আমি যতটা বুঝেছি তাতে শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দত্তের নিকটে কবির আর কোনো দায়-দায়িত্ব নেই।

আমার মনে হয় কবির পুস্তকগুলি প্রকাশ করার জন্যে একটি বিশেষজ্ঞের কমিটি নিযুক্ত করতে হবে। সেই কমিটি বিশেষভাবে যাচাই করে পুস্তকগুলি প্রেসে পাঠাবার অনুমতি দিবেন। কবির নিয়ম ছিল যে প্রথম মুদ্রণের পুস্তকগুলি প্রকাশিত হলে ছাপার ভুলগুলি শুদ্ধ করে প্রত্যেক পুস্তকের কয়েক কপি বন্ধুদের তিনি উপহার দিতেন। কবির গ্রন্থাবলী প্রকাশ করার জন্যে এই রকম পুস্তক সংগ্রহ করতে হবে। আমার বিশ্বাস আছে যে চেষ্টা করলেই কবির স্বাক্ষরিত ও সংশোধিত পুস্তক পাওয়া যাবে।

গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হলে তার একটা রয়ালটি নির্ধারণ করে কবির জন্যে তা খরচ করতে হবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ কবি যদি আর না থাকেন তবে রয়ালটির টাকাটা কবির দুই পুত্র যেন পায় এমন একটা ব্যবস্থাও করতে হবে।

কবি আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় পাকিস্তান কিন্তু "নজরুল-রচনাবলী" প্রকাশের কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন। এই কাজটি হাতে

নিয়েছেন সে দেশের "কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড"। এটা শুনেছি একটি আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান। আমাদের দেশের মতো সে দেশে আপাতত স্বত্ব বিক্রয় বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। এ যাবত রয়াল অক্টাভো সাইজের দু'টি বড় বড় খন্ড বা'র হয়ে গেছে। প্রথম খণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৫৪ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ৬৭৫।

পূর্ব পাকিস্তানে একদল লোক কবির লেখায় বিকৃতি ঘটাচ্ছেন। কিন্তু, "কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন বোর্ড" সে দলের নন। তাঁরা কবির লেখার বিশুদ্ধি রক্ষা করেছেন। সুখের বিষয় এই যে কবি আবদুল কাদির নজরুল ইস্‌লামের একজন বন্ধু এবং তাঁর লেখা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল।

কলিকাতা
২৫ মে, ১৯৬৯

কবিস্বীকৃতি

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

কাজী নজরুল ইসলাম ব্যক্তিটি সম্পর্কে আজ জনসাধারণের প্রবল আগ্রহ তাঁর বোবা জীবনকে সহনীয় তথা রমণীয় করার প্রয়াসে ভারতে ও পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকার পরস্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। কিন্তু কবি নজরুল ইসলামের কবিকৃতির আলোচনা সাহিত্য বিচারক ও সাহিত্য গবেষকদের মধ্যে তেমনভাবে লক্ষণীয় নয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার নজরুল রচনা-সম্ভার প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে নজরুল সাহিত্যের চাহিদা তেমন লক্ষণীয় নয়। নজরুল জন্মদিনে যাঁরা পুষ্পস্তবক নিয়ে তাঁকে দর্শন করতে যান, তাঁদের সেই কবির প্রতি ব্যক্তিভক্তি তাঁর রচনানুরাগে পরিব্যাপ্ত নয়। প্রমাণ স্বরূপ বলতে পারি যে নজরুলের সে দিনের শ্রেষ্ঠ সংগ্রামী সংগীতগুলির কোন সংগ্রহ বাজারে প্রচলিত নেই। চাহিদা থাকলে নিশ্চয়ই পুস্তক-ব্যবসায়ীরা তা সাগ্রহে প্রকাশ করতেন। দু-চারখানা সংকলন গ্রন্থ ছাড়া নজরুলের কবিতা, গান ও গদ্যরচনাগুলি ইতিমধ্যেই অপ্রচলিতত্বে পৌঁছে গেছে।

নজরুল সম্পর্কে আজহারউদ্দিন খাঁ বা বন্ধুবর মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদ-এর আলোচনা গ্রন্থে নজরুলের বিচিত্র জীবনের তথ্য যতখানি আছে, ঘটনা সন্নিবেশে 'বিদ্রোহী' রচনার স্থান-কাল নির্ণয় নিয়ে বিতর্ক আছে। কিন্তু তার রচনার সাহিত্যিক মূল্য বিচার নিয়ে কোন আলোচনা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বলে আমি জানি না।

'কাব্য পড়ে যেমন ভাবো কবি তেমন নয়'—এ কথা স্বয়ং কবিগুরুই বলেছেন। কিন্তু কবির কাব্যের ধারাবাহিক মূল্যায়নে যতখানি প্রয়োজন কবির জীবন-কাহিনীতে তার বেশি ঘটনা খোঁজার আগ্রহ কবি স্বীকৃতির অনুকূল নয়।

নজরুল নিজে তাঁর কবি পরিচিতির চেয়ে জাতীয় সৈনিক পরিচিতিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ যুগের হুজুগ কেটে গেলে বাঁচা-

মরা নিয়ে পরোয়া করেন নি তিনি, কিন্তু সেদিনের যুগচেতনার তিনিই যে ছিলেন মূর্ত বাণীরূপ, এ কথা যাঁরা সেদিন তরুণ ছিলেন তাঁরা সবাই আজও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। যুগের হুজুগ কেটে গেলে যে কবি বাঁচে না তাঁর প্রকৃত কবি মণীষা সম্বন্ধে প্রশ্ন করার রেওয়াজ আছে। কিন্তু যুগ মানসকে কাব্যে রূপায়িত করাও যে মহাকাব্যের লক্ষণ, এও সর্বজনস্বীকৃত।

আজকের এই 'ঝুটা আজাদীর' প্রতি ধিক্কারে মুখর তরুণ সমাজ কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারে না সেদিন পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙতে চাওয়ার আবেগ কি পরিমাণ প্রবল ছিল। কি গভীর ছিল ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণের আবেগ ও জনমনে তার প্রভাব।

সেদিনের তরুণ গণমানসকে আজ যদি খুঁজে বার করতে হয়, তাকে ধরাছোঁয়া নাগালের মধ্যে পেতে হয়, তবে একমাত্র নজরুলের কবিতা, গান ও অনেকগুলি গদ্যরচনার মধ্যেই তা আজও পাওয়া যাবে। আর যে বলিষ্ঠ ভবিষ্যৎ দৃষ্টি কবিতার বিশেষ সম্পদ্, সে দিক দিয়ে নজরুলের প্রায়স অতুলনীয়। বস্তুত বাঙলা কবিতায় সাম্যবাদী চেতনা ও গণ-সংগ্রামের আহবানে নজরুলই পথিকৃৎ।

নজরুলের রোমাণ্টিক কবিতা, দেশবধু সম্পর্কিত শোক কবিতাগুলি ও তাঁর বিচিত্র গীতি সম্ভার—নজরুল-সাহিত্যের আর এক দিক।

নজরুলের আমি আযৌবন বন্ধু ও সাথী হিসেবে আমি মানুষটিকে তাঁর কবিতার চেয়ে অনেক বেশি চিনেছি এবং ভালোবেসেছি। তা ছাড়া কাব্যের চুলচেরা সাহিত্যিক বিচার করার মত বিশ্লেষণমূলক মানসিকতাও আমার নেই। আমি কবিতার বিচার করি কবিতা পাঠের মানসিক প্রতিক্রিয়া দিয়ে, আমার সেই মানসিক বিচারে নজরুল সার্থক কবি।

নজরুলের কবি প্রতিভার মূল্যায়নে এ যুগ নীরব ও নিষ্ক্রিয়, কিন্তু সে যুগ ছিল বিতণ্ডামূলক। অন্তত রবীন্দ্র-অনুচরদের মধ্যে অস্বীকৃতির প্রয়াস যথেষ্ট ছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে কবিকে নস্যাৎ করতেন অনেকে। নজরুলের কাব্যপ্রয়াস ছিল 'তরোয়াল দিয়ে দাড়ি চাঁছা।'

অথচ নজরুলের রচনায় অসির ঝঞ্ঝনাও সার্থক কবিতা হয়ে উঠেছে এমন স্বীকৃতি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দিয়েছিলেন ১৩২৯ সালের ফাল্গুনে প্রকাশিত 'বসন্ত' গীতিনাট্যের উৎসর্গ-পত্রে—বইখানি উৎসর্গ করা হয়েছিল—শ্রীমান কবি নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু।

নজরুলের কবিস্বীকৃতি শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক উল্লেখেই সীমায়িত রাখেন নি কবিগুরু। নজরুলকে কবিস্বীকৃতি দিয়ে কবি যে ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিয়েছিলেন, সেই ভীমরুলদের হুল ফোটানোর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে যে সব উক্তি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তা আমার স্বকর্ণে শোনা।

নজরুল তখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কারারুদ্ধ। আমি প্রতি সপ্তাহেই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আমার সঙ্গে নজরুলের নিয়মিত যোগাযোগের খবর নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের কাছে পেঁাছেছিল, নইলে মধু রায়ের গলির মেসে স্নেহভাজন বুলা মহলানবীশকে পাঠিয়ে আমাকে জোড়াসাঁকোয় ডাকিয়ে নিতেন না গুরুদেব। একবার সুবিধা মতো দেখা করবার কথা বললেন বুলাবাবু। কিন্তু ঠাকুর সন্দর্শনে কালবিলম্ব অনুচিত বিবেচনা করে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম এবং বুলাবাবুর সঙ্গে গল্পে গল্পে কয়েক পা হেঁটেই জোড়াসাঁকোর বিচিত্র ভবনে এসে হাজির হলাম। সেখানে অনুচর তথা ভক্তজন পরিবৃত হয়ে কবিগুরু আসীন। আমাকে দেখে প্রথমে কুশল প্রশ্ন করে নজরুলের খবর জানতে চাইলেন এবং আমি যে তাঁর সঙ্গে নিয়মিত দেখা করি সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলেন আমাকে প্রশ্ন করে। বললেন, জাতির জীবনে বসন্ত এনেছে নজরুল। তাই আমার সদ্য প্রকাশিত 'বসন্ত' গীতিনাট্যখানি ওকেই উৎসর্গ করেছি। সেখানা নিজের হাতে তাকে দিতে পারলে আমি খুশি হতাম, কিন্তু আমি যখন নিজে গিয়ে দিয়ে আসতে পারছি না, ভেবে দেখলাম, তোমার হাত দিয়ে পাঠানোই সবচেয়ে ভালো, আমার হয়েই তুমি বইখানা ওকে দিও।

কোনো বিষয়েই আপনার প্রতিনিধিত্ব করবার ধৃষ্টতা আমার নেই, আমি বললাম। বরং আপনার অনুগ্রহ-আদেশ পেলে বন্ধু নজরুলের প্রতিনিধি হিসেবে আপনার কাছ থেকে হাত পেতে আপনার উৎসর্গীত গ্রন্থখানা গ্রহণ করব, সঙ্গে আপনার আশীর্বাদ আমি বয়ে নিয়ে যাব তার কাছে। এ দুর্লভ সুযোগ কি করে আমি ছাড়ি বলুন, বন্ধুভাগ্যে যদি কিছু পাই তাই আমার পরম পাওয়া।

কথার মারপ্যাঁচ তো বেশ শিখেছ পবিত্র।

শুনে অমল হোম মন্তব্য করলেন, বীরবলী কাব্যবিন্যাসের পরিবেশে বাস করে তো উনি।

আমি জবাব করি, বাস করি না, করতাম। তবে আপাতত যাঁর প্রতিভূ হয়ে এসেছি তিনি কিন্তু সরল সহজ ভাষায় বক্তব্য পেশ করেন। কবির

ইঙ্গিত পেয়ে আমি ততক্ষণে ফরাসের উপর বসে পড়েছি।

কবি আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, বিদগ্ধ বাগ্‌বিন্যাসের যেমন মূল্য আছে, সহজ সরল তীব্র ও ঋজু বাক্যের মূল্যও কিছু কম নয়।

কিন্তু সহজ সরল তীব্র ও ঋজু বাক্য মাত্রই কবিতা বা সাহিত্য হয়ে ওঠে না, মন্তব্য করলেন অমল হোম।

কখ্‌খনো নয়। তীব্রতাই যদি কাব্যগুণের আধার হত, তাহলে তোমার প্রতিটি কথাকেই তো কবিতা বলা যেত। তীব্রতাও রসাত্মক হলেই কাব্য হয়ে ওঠে। যেমন উঠেছে নজরুলের বেলায়।

সবাই চুপচাপ। দু-চারটি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি কবির দিকে নিবদ্ধ। একটু থেমে আবার তিনি বললেন, নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে তোমাদের মনে যেন কিছু সন্দেহ রয়েছে।

তখনো সবাই নীরব।

এবার কবি যেন বক্তব্য পেশ করতে চান। তবে তাতে কৈফিয়তের সুর নেই।

নজরুলকে আমি 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করেছি এবং উৎসর্গ পত্রে তাকে 'কবি' বলে অভিহিত করেছি। জানি, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এটা অনুমোদন করতে পার নি। আমার বিশ্বাস, তারা নজরুলের কবিতা না পড়েই এই মনোভাব পোষণ করছে। আর পড়ে থাকলেও তার মধ্যে রূপ ও রসের সন্ধান করে নি, অবজ্ঞাভরে চোখ বুলিয়েছে মাত্র।

মার্ মার্ কাট্ কাট্ ও অসির ঝন্‌ঝনার মধ্যে রূপ ও রসের প্রক্ষেপটুকুও হারিয়ে গেছে, উপস্থিত একজন মন্তব্য করলেন।

কাব্যে অসির ঝন্‌ঝনা থাকতে পারে না, এও তোমাদের অদ্ভুত আবদার বটে। সমগ্র জাতির অন্তর যখন সে সুরে বাঁধা, অসির ঝন্‌ঝনায় যখন সেখানে ঝংকার তোলে, ঐকতান সৃষ্টি হয়, তখন কাব্যে তাকে প্রকাশ করতে হবে বৈ কি! আমি যদি আজ তরুণ হতাম, তাহলে আমার কলমেও ওই সুর বাজত।

কিন্তু তার রূপ হত ভিন্ন, আর একজনের মন্তব্য শোনা গেল।

দু-জনের প্রকাশ তো দু রকম হবেই, কিন্তু তা বলে আমারটা নজরুলের চেয়ে ভাল হত, এমন কথাই বা জোর করে বলবে কি করে!

যাই বলুন, এ অসির ঝন্‌ঝনা জাতির মনের আবেগে ভাটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নজরুলী কাব্যের জনপ্রিয়তাও মিলিয়ে যাবে, মন্তব্য এল ফরাস থেকে।

জনপ্রিয়তা কাব্য বিচারের স্থায়ী নিরিখ নয়, কিন্তু যুগের মনকে যা প্রতিফলিত করে তা শুধু কাব্য নয় মহাকাব্য।

সবাই চুপচাপ। প্রসঙ্গান্তর তুলে কবি জানতে চাইলেন, আমি কবে যাব নজরুলের কাছে। আমি জানালাম বুধবারে আমার ইন্টারভিউর দিন।

কে যেন দু কপি 'বসন্ত' এনে দিল কবির হাতে। তিনি একখানায় নিজের নাম দস্তখত করে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, তাকে বোলো, আমি নিজের হাতে তাকে দিতে পারলাম না বলে সে যেন দুঃখ না করে। আমি তাকে সমগ্র অন্তর দিয়ে অকুণ্ঠ আশীর্বাদ জানাচ্ছি। আর বোলো, কবিতা লেখা যেন কোন কারণেই সে বন্ধ না করে। সৈনিক অনেক মিলবে, কিন্তু যুদ্ধে প্রেরণা জাগাবার কবিও তো চাই।

জেলের ইন্টারভিউ নিয়মমাফিক গরাদের ব্যবধানে আমি প্যাকেট খুলে গুরুদেবের উৎসর্গ-পত্র দেখাতেই নজরুল লাফ দিয়ে পড়ল লোহার গরাদগুলির উপর। বন্দীর প্রবল উত্তেজনা লক্ষ্য করে ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ডার কারণ জানতে চাইল। আমি যখন বললাম, পোয়েট টেগোর ওকে একখানা বই ডেডিকেট করেছেন। সাহেব আমার ইংরেজীর ভুল ধরে বলল, ইউ মীন প্রেজেন্টেড? আমি জোর দিয়ে বললাম, নো, ডেডিকেটেড।

সাহেবের মুখে বিস্ময়।

ইয়ো মীন দি কন্‌ভিক্ট ইজ সাচ্‌ অ্যান ইমপর্টান্ট পারসন।

ইয়েস, আওয়ার গ্রেটেস্ট পোয়েট নেকস্‌ট টু টেগোর।

এক সেকেণ্ড কি ভেবে সাহেব দরজাটা খুলে আমাদের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে ধরে নাচতে শুরু করল নজরুল। তারপর হঠাৎ খেয়াল হতে ছিটকে পড়া বইখানা তুলে নিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বুকে চেপে ধরল।

দু কপির অপর কপি চেয়ে নিল ওয়ার্ডার সাহেব।

উত্তেজনা একটু প্রশমিত হতে নজরুল জিজ্ঞাসা করল, আর কি বলেছেন গুরুদেব?

বলেছেন তুই যেন কবিতা লেখা বন্ধ করিস না।

গুরুর আদেশ শিরোধার্য বলে সেদিন আমাকে বিদায় করেছিল নজরুল। নজরুলের কবিত্বে প্রত্যয় ছিল বলেই কবি তাকে ওই নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন। অসি ঘোরাতে বলেন নি, কবিতায় অসির ঝন্‌ঝনা প্রকাশের কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামী চেতনা উদ্বোধনের গান গাইতে।

টুক্‌রো কথা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

নজরুল সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা লিখেছেন। অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি তার কবিপ্রতিভা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আজ লিখতে বসেছি অন্য কথা।

কবি-নজরুলের চেয়ে মানুষ-নজরুল আমার কাছে অনেক বড়ো। আমি সেই মানুষ-নজরুলের কথাই বলব।

একই দেশে আমাদের বাড়ী, একই জল-হাওয়ায় আমরা মানুষ হয়েছি, নজরুল আমার সহপাঠী বাল্যবন্ধু।

আমরা যখন পরস্পর পরস্পরকে ভালবেসেছিলাম, অনেক বন্ধুর মাঝখান থেকে আমরা যখন একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম, তখন আমরা বাংলার কাব্য-জগৎ বা সাহিত্য-জগতের কেউ নই।

আমি সেই নজরুলকে চিনি—যে-নজরুল পাশের গ্রামের বাসন্তী পুজোর সময় ভাঙা একটা পাঁচিলের ওপর বসে যাত্রাগান শুনছে, যে-নজরুল 'লাটোর' দলে বসে ঢোলক্ বাজাচ্ছে, যে-নজরুল সুর করে রামায়ণ পড়ছে, মহাভারত পড়ছে।

আজ নজরুলের কথা লিখতে গিয়ে এমন সব কথা আমার মনে পড়ছে যার সাহিত্যিক মূল্য হয়ত কিছুই নেই, কিন্তু মানবিক মূল্য হয়ত-বা কিছু আছে।

আমরা তখন ইস্কুলের ছাত্র। ষোলো-সতেরো বছর বয়স।

ইস্কুলের ছুটির পর সেদিন বিকেলে নজরুল এল আমাকে ডাকতে। শিয়াড়শোলের শিসু-বাগানের কাছে একজন সন্ন্যাসী এসেছে, চল দেখে আসি! বৈশাখ মাস। আমাদের কয়লাকুঠির দেশে তখন দারুণ গরম। তবু সেই কাঁকর-পাথরের ডাঙ্গার উপর দিয়ে পরমানন্দে চলে গেলাম সন্ন্যাসী দেখতে।

গিয়ে দেখি—কোথায় সন্ন্যাসী? বড়ো বড়ো শিসু গাছের বাগান। আমরা দু'জন তার ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে কোথাও সন্ন্যাসীকে দেখতে পেলাম না।

কে একজন বললে, ছিল একজন উলঙ্গ সন্ন্যাসী—ওই গাছের তলায় ধুনি জাগিয়েছিল। আজ সকাল থেকে দেখতে পাচ্ছি না। চলে গেছে।

ওদিকে তখন পশ্চিম আকাশটা কালো করে কাল-বৈশাখীর মেঘ উঠেছে। জনহীন বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ। সেই মাঠের ওপর দিয়ে ফিরে আসছি তাড়াতাড়ি। আমি হঠাৎ আছাড় খেয়ে পড়লাম মাঠের ওপর। কাঁকরে পাথরে হাঁটুর কাছে খানিকটা চামড়া কেটে গেল। গল্ গল্ করে রক্ত গড়াতে লাগল।

নজরুল চট করে তার নিজের কাপড় দিয়ে চেপে ধরল সেই জায়গাটা। রক্তে তার কাপড়টা ভিজে গেল। বললাম, এ কী করলে?

নজরুল বললে, ও কিছু না। সাবান দিলেই উঠে যাবে।

সেদিকে তার ভ্রুক্ষেপ নেই। সে চায় আমাকে সুস্থ করে তুলতে। বললে, হাঁটতে পারবে তো?

—নিশ্চয় পারব। চলো।

ঝড়ের বেগ থেমে এসেছে। আমাদের আর দৌড়োতে হচ্ছে না।

নজরুল বলছে, সাইকেল চড়তে গিয়ে এই দ্যাখো আমার পায়ের এই জায়গাটা কেটে গিয়েছিল। আর-একবার গাছে উঠে আম পাড়তে গিয়ে—সড়াক্ দুম!

আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে এই রকম সব কত কথাই-না বলতে বলতে চলেছে নজরুল।

শহরে আসতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

রাস্তার পাশে সাধনদের বাড়ী। নজরুল থামল। সামনের ঘরে বসে আছে সাধনের দাদা। আমাদের দেখেই বলে উঠলো, এই যে মানিকজোড়, তোমাদের আর-একটি কোথায়? সেই যে সেই ক্রিশ্চান বন্ধুটি—সেই যে শৈলেন না কী নাম? তিনটি বন্ধু বেশ জুটেছ যা-হোক্!

কিন্তু সে-সব কথা শুনতে আমরা যাই নি।

নজরুল বললে, তোমার কাছে টিনচার আইডিন একটু আছে তো দাও। এই দ্যাখো—এ আছাড় খেয়েছে। এইখানে লাগিয়ে দেব।

সাধনের দাদা দেখলে। দেখে বললে, আইডিন কি হবে? রাস্তার ধুলো একমুঠো নিয়ে ওইখানে ঘষে দাও। ভাল হয়ে যাবে।

সাধনের দাদা আমাদের সঙ্গে রসিকতা করছে দেখে নজরুলকে টেনে আনলাম সেখান থেকে।

—আইডিন আছে আমাদের বাড়ীতে। এসো।

নজরুল বললে, সাধনের দাদা ডাক্তারী পাশ করে এসেছে কলকাতা

থেকে। ডাক্তারের কথা শুনলে? দিনকতক পরে দেখব—সাধনের দাদা প্র্যাক্‌টিস্‌ করছে। এরাই হবে আমাদের দেশের ডাক্তার।

আইডিন কিন্তু লাগানো হয় নি।

কেন হয় নি সে-সব কথা শুনে কাজ নেই।

একটা লণ্ঠন নিয়ে পড়তে বসেছিলাম। রাত্রি তখন কত কে জানে। ঘরে ঘড়ি ছিল না।

হঠাৎ দেখি নজরুল এসে দাঁড়িয়েছে। তার দু'হাত ভর্তি অনেক-গুলো নিমের পাতা।

—নিমের পাতা কি হবে?

নজরুল বললে, এইগুলো বেশ করে বেঁটে ওইখানে লাগিয়ে দাও। কাল সকালে দেখবে ভাল হয়ে গেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, এত রাত্রে নিমের পাতা কোথায় পেলে?

নজরুল বললে, ক্রিশ্চানদের গোরস্থানের সামনে সেই যে বড়ো নিম-গাছটা, সেইখান থেকে নিয়ে এলাম। নিমের গাছ খুঁজতেই তো দেরি হয়ে গেল।

বললাম, এই অন্ধকার রাত্রে তুমি সেই গাছটায় উঠলে?

—তাতে কি হয়েছে?

—তাতে কি হয়েছে! তুমি জানো না ওই গাছটায় ভূত আছে!

নজরুল বললে. তোমার মুণ্ডু আছে!—এক্ষুনি বাঁটতে দাওগে। আমি চলি।

বলেই সে নিমের পাতাগুলো রেখে তাড়াতাড়ি চলে গেল। জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেল আমি আইডিন্‌ লাগিয়েছি কিনা।

আমিও বেঁচে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলে জবাব দিতে পারতাম না। দেখতে চাইলে বিপদে পড়তাম।

আবার না ফিরে আসে! দোরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

না, ফিরে সে এল না। শুধু দেখলাম তার কাপড়ে আমার রক্তের দাগটা তখনও জ্বল্‌ জ্বল্‌ করছে।

এই নজরুল!

চওড়া বুকের ছাতি, বড়ো বড়ো চোখ, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুন্দর দেহ।

মাথার চুলগুলো কিছুতেই বাগ মানছে না—এই যা দুঃখ। অথচ আমার মাথার চুল খুব সুন্দর। কেমন করে সুন্দর হলো বুঝতে পারি

না। লোকে ভাবে বুঝি আমি সখ করে মাথায় বড় বড় বাবরি চুল রেখেছি। কিন্তু আসলে তা নয়। চুল কাটাবার পয়সা পাই না। এমনকি চুল আঁচড়াবার একটা চিরুনী পর্যন্ত ছিল না।

নজরুল কিন্তু আমার এই মাথার চুলের অন্য একটা মানে করে নিয়েছে। আমাকে মাঝে-মাঝে ডাকে 'কবি' বলে! তার কারণ অবশ্য একটা আছে। আমি তখন লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লিখি। আর নজরুল লেখে গল্প।

নজরুল যা লেখে, আমাকে শোনায়। আর আমি যা লিখি নজরুলকে শোনাই। আর কাউকে শোনাতে ইচ্ছে করে না। শোনালে তারা বিশ্বাস করে না। বলে, ও আমাদের নিজের লেখা নয়। কোথাও থেকে চুরি করেছি।

আমাদের সেই ক্রিশ্চান-বন্ধু শৈলেন শোনে মাঝে-মাঝে। শোনে আর ফিক্ ফিক্ করে হাসে। বলে, ওগুলো ছিঁড়ে ফেলে দাও। কিস্সু হয়নি।

আমাকে রাগায়। বলে, ওইজন্যেই বুঝি মাথায় চুল রেখেছ? চুল রাখলেই কবি হয় না।

নজরুলকে বলে, তুমি গল্প লিখে কোনোদিন বঙ্কিমচন্দ্র হবে না। এই আমি বলে রাখছি।

শৈলেনের কথায় আমরা রাগ করতাম না। শৈলেন ছিল আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

সে আজ আর ইহজগতে নেই।

কিন্তু যাবার আগে সে দেখে গেছে—আমরা আমাদের পেশা বদলে নিয়েছি। আমি লিখছি গল্প, আর নজরুল হয়েছে কবি।

মাঝখানে কিছুদিনের জন্য নজরুল ছিল করাচিতে। উনপঞ্চাশ নম্বর বেঙ্গলী রেজিমেন্টে গিয়েছিল যুদ্ধবিদ্যা শিখতে। আমিও নাম লিখিয়েছিলাম। কিন্তু আমার বুকের মাপ হয়েছিল আধইঞ্চি কম। তাই আমাকে খুব সাঁতার কাটবার উপদেশ দিয়ে তিনমাস পরে আবার রিক্রুটিং আপিসে যেতে বলেছিল।

আমি আর যাইনি।

আমি আর শৈলেন সেই ফাঁকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে কলকাতায় এসেছি কলেজে পড়তে।

এমন দিনে নজরুল ফিরে এল করাচি থেকে। ফিরে এল হাবিলদার হয়ে। সবাই বলতে লাগল সৈনিক কবি।

সেই সময় সে লিখলে তার বিখ্যাত কবিতা—'বিদ্রোহী'।

এক কবিতাতেই দিগ্বিজয় করলে। নাম হলো 'বিদ্রোহী কবি'।

দেখতে দেখতে তার কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো চারিদিকে। তখন সে গান গাইছে, গান লিখছে। সভায় সমিতিতে, বাড়ীর আড্ডায়, ছেলেদের হোস্টেলে তাকে নিয়ে টানাটানি চলছে।

নজরুলের মুহূর্তের অবসর নেই।

আমাদের দেখে যেন সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে! আড্ডা ছেড়ে পালিয়ে আসে।

সেখানে সদ্যপরিচিত স্তাবক আর অনুরাগীর দল। মার্জিতরুচি শিক্ষিত মানুষের মজলিস। সংখ্যায় অগণ্য।

আর আমাদের আড্ডা? নগণ্য বললেই হয়। আমি, নজরুল আর শৈলেন। এখানে আবার যেন আমরা সেই পুরনো দিনে ফিরে যাই। এখানে কবি বলে নজরুলের আলাদা কোনও সম্মান নেই। সবই এখানে অবারিত, অনর্গল এবং নিরাভরণ। শান্তিপুরী পোশাকী ভাষায় কথা বলা নজরুলের তখনও ভাল রপ্ত হয়নি। আমাদের জন্মভূমি সেই রাঢ় অঞ্চলের প্রচলিত মাতৃভাষায় প্রাণ খুলে কথা বলে, আর হো হো করে হাসে।

এমন-সব কথা, এমন-সব গল্প,—যা ওখানে বলা চলে না, নজরুল এখানে তাই বলে। যে-গানটি তার সব-চেয়ে প্রিয় সেই গানটি শোনায়, যে কবিতাটি সবে লিখেছে সেই কবিতাটি আবৃত্তি করে।

শৈলেন বলে, যাক্, এতদিন পরে আমার সেই কথাটি আমি withdraw করে নিলাম। তবে 'উইথ্‌ড্র' করবার দরকার হত না—যদি-না তোমাদের লেখাদুটো তোমরা পাল্‌টা-পাল্‌টি করে নিতে। তুমি যদি গল্প লিখতে আর শৈলজা যদি কবিতা লিখত, তাহলে তোমরা দু'জনেই মরতে।

নজরুলের তখন যা অবস্থা, তাকে ঠিক বেঁচে থাকা বলে না। সবাই হৈ-হৈ করছে, টানাটানি করছে, বলছে, গান গাও, কবিতা শোনাও! বাহবা দিচ্ছে, প্রশংসা করছে। কিন্তু কি খেয়ে কেমন করে সে বেঁচে আছে সেদিকটা কেউ দেখছে না। একটা পয়সা আসছে না কোথাও থেকে। কি কষ্টে যে তার দিন চলছে তা জানি একমাত্র আমি। কবিতার জন্যে দশটি টাকার বেশি কেউ দিতে চায় না। কবিতার বই কেউ ছাপতে চায় না। যে গল্পগুলো সে লিখেছিল—তার কপিরাইট্ বেচবার জন্যে আমিও চেষ্টা করছি। সেও চেষ্টা করছে। শান্তিপুর থেকে অফ্‌জল-উল্-হক্

এসেছে কলকাতায়। 'মোস্লেম ভারত' মাসিক পত্রিকা বের করেছে, আর কলেজ স্কোয়ারে একটি বই-এর দোকান করেছে। গল্পগুলির কপিরাইট সে নিতে চায়। তাও তো একশো টাকার বেশি দিতে চায় না।

এই দুঃখের কথাগুলো আর-কেউ শোনে নজরুল তা চায় না। আর-কেউ কাছে না থাকলে নজরুল আমাকে তিরস্কার করে। বলে, তোমার এ কী রকম স্বভাব বল তো! যার-তার কাছে আমাদের দুঃখের কথাগুলো বল কেন?

আমিও তাকে তিরস্কার করি।—তুমিই-বা কেমন শুনি? যারা দু'পেয়ালা চা খাইয়ে সারাদিন তোমাকে নিয়ে হৈ হৈ করে, গাধার মত খাটিয়ে নেয়, তাদের তুমি বলতে পার না?

নজরুল বলে, তাদের কি বলব? আচ্ছা বোকা তো!

—তাদের বলবে তুমি যাবে না। তোমাকে লিখতে হবে। তোমার টাকার দরকার। দুটো কবিতা লিখলে কুড়িটা টাকা তো পাবে!

এই সময় মুজাফ্ফর আহ্মদ-সাহেব নজরুলের জন্য যা করেছিলেন তার তুলনা হয় না। তাঁরও আর্থিক অবস্থা মোটেই সচ্ছল ছিল না। তারা দু'জনে কি কষ্টে যে জীবনযাপন করেছে তা আমি নিজে দেখেছি।

মুজাফ্ফর আহ্মদ-সাহেব নজরুলকে যে কী চোখে দেখেছিলেন তা আমি বলতে পারব না। বলা সহজ নয়। নজরুলের চরিত্রমাধুর্য, তার গান, তার কবিতা—মানুষকে আকর্ষণ করে সত্য। তার প্রতি অনুরাগ স্বাভাবিক। কিন্তু নজরুলের প্রতি মুজাফ্ফর আহ্মদ-সাহেবের অনুরাগ যেন তারও ঊর্ধ্বে। এমন নিঃস্বার্থ প্রেম আমি খুব কমই দেখেছি। এবং শুধু এই জন্যেই সেই সর্বত্যাগী, নিরহংকার সত্যাশ্রয়ী এবং জনকল্যাণব্রতী এই অক্লান্ত কর্মযোগী মানুষটির প্রতি আমার শ্রদ্ধা চিরদিন অবিচলিত রয়ে গেল।

নজরুলের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে দীক্ষা তাঁরই সাহচর্যে এসে। একখানি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করবার ইচ্ছা মুজাফ্ফর-আহ্মদ সাহেবের ছিল মজ্জাগত। নজরুলকে নিয়ে একের পর এক পত্রিকা তিনি প্রকাশও করেছেন। বৃটিশ-সরকারের অনুগ্রহে সেগুলি বন্ধও হয়ে গেছে। তার জন্য নজরুল জেলও খেটেছে।

রাজনীতির নানান ধর্ম। সেখানে অনেক মত, অনেক দল। নজরুলকে নিজের দলে টেনে হাতিয়াররূপে ব্যবহার করতে চেয়েছেন অনেকে। নজরুলের সঙ্গে প্রথম যেদিন রবীন্দ্রনাথের দেখা হয় সেদিন আমি তার সঙ্গে ছিলাম। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আমি সব লক্ষ্য

করছি। ওরা তলোয়ার দিয়ে দাড়ি কামিয়ে নিচ্ছে। তুমি চল শান্তিনিকেতনে। সেখানে মনের আনন্দে গান লিখবে আর গান গাইবে। তুমি চারণ কবি। নজরুল কিন্তু শান্তিনিকেতনেও যায়নি, কোনও ধর্মেই পুরোপুরি দীক্ষিতও হয়নি।

সে তার নিজের কবিধর্মে চিরকাল একনিষ্ঠ এবং তন্ময় হয়েই ছিল।

আমি কিন্তু সেসব কথা বলতে চাই না। এখানে আমার বক্তব্য রাজনীতি নয়। আমি বলতে চাই মানুষ-নজরুলের কথা।

আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে আমি পক্ষপাতিত্ব করছি না, একবিন্দু বাড়িয়ে বলছি না। নজরুলের মত এমন হৃদয়বান্ এমন অপূর্বসুন্দর একটি মানুষ আমি আমার জীবনে কখনও দেখিনি।

শৈলেনের সঙ্গে দেখা হলেই শৈলেন তাকে নানারকম কথা বলে খোঁচা মারতে।

নজরুলের মাথার চুলের দুঃখু ছিল চিরকাল—সেকথা আগেই বলেছি। তখন তার চুলগুলি বেশ বড়ো বড়ো হয়েছে। শৈলেন বলত, টাকার দুঃখু তোমার ঘুচবে না বুঝতে পারছি। এখন চুলের দুঃখু ঘুচেছে, চুলগুলো বাগিয়েছ, কবি-কবি চেহারা হয়েছে, তাইতেই খুশী হয়ে থাকো।

চুলের প্রশংসায় নজরুল ভারি খুশী! বলে, শৈলজার মত হয়েছে তো?

শৈলেন বলে, শৈলজার চেয়ে ভাল হয়েছে।

আমি বলেছিলাম, আমি চুলগুলো এবার কেটে ফেলব কিন্তু। এখন তো আমি কবি নই।

নজরুলের খুব আপত্তি, বলত, না না দোহাই তোমার, কেটো না।

শৈলেন বলেছিল, তা নাহয় কাটবে না। কিন্তু তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। তোমার ওই চুলগুলোকে জটা করে ফেলতে হবে। তারপর সারা গায়ে ছাই মেখে বোম্ বোম্ করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হবে, নয়তো হিমালয়ে গিয়ে বসতে হবে। ত্রিশূল একটা আমি তৈরি করে দেব।

এমন কিছু হাসির কথা নয়, তবু আমরা হাসতাম।

শৈলেন বলত, হেসো না। ও যেমন সব রকমে নিরাসক্ত, আর মহাদেবের চরিত্রের সঙ্গে ওর যেরকম মিল, শেষ পর্যন্ত তাই না হয়ে যায়!

তারপর নজরুলকে বলত, খবরদার বলছি—আর যাই হও, মহাদেব

হবে না। সব ব্যাটা সমুদ্র মন্থন করে অমৃতটুকু লুটে নিয়ে তোমার হাতে তুলে দেবে বিষ। আর সেই বিষ খেয়ে নীলকণ্ঠ হয়ে তুমি ভোম্ মেরে বসে থাকবে।

শৈলেনের কথা বলবার ধারাই ছিল এমনি।

নজরুল হো হো করে হাসতো আর বলত, না না মহাদেব হওয়া অমনি মুখের কথা কি না!—'আমি হব না হব না হব না তাপস—যদি না পাই তপস্বিনী!' মহাদেব হতে হলে পার্বতী চাই যে! পার্বতী কোথায় পাব?

শৈলেন বলত রাজা-মহারাজাদের অন্দরমহল থেকে যেরকম ঘন-ঘন ডাক আসছে তোমার—পার্বতী একটি জুটে যাবে ঠিক।

নজরুল তখনও বিয়ে করেনি।

শৈলেন বলত, তুমি যে কি ধাতুতে গড়া বুঝতে পারি না ভাই। তোমার এত অভাব এত দুঃখু, তবু মুখের হাসি তো বন্ধ হয় না কিছুতেই!

আমি বলতাম, ওটা একটা পাগল।

ও যে চায় না কিছুই। যে চায় না সে পায় না। এ পৃথিবীর নিয়মই এই। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

নজরুল চেয়েছিল শুধু আনন্দ। সে তার অন্তরের ভেতর থেকে স্বতঃউৎসারিত পরমানন্দ। টাকা নয়, পয়সা নয়, ক্ষুধার অন্ন নয়, পার্থিব কোনও সম্পদ্ নয়, সুর-সুন্দরের কাছ থেকে যে-আনন্দ তার আপনিই আসে। সেই আনন্দে সে দিনরাত মশগুল হয়ে থাকে।

'আপন গন্ধে ফিরি মাতোয়ারা কস্তুরীমৃগ সম।'

একদিন খাবার সময় নজরুলের আস্তানায় গিয়ে হাজির হয়েছিলাম।

মুজাফ্ফর আহ্মদ আর নজরুল থাকে একসঙ্গে। কমবয়সী একটি ছোকরা রান্না করে দেয়। তার নামটি আমি ভুলে গেছি।

মজাফ্ফর-সাহেব বোধকরি খেয়ে বেরিয়ে গেছেন। নজরুল কোথায় যেন যাবে। কয়েকজন ছোকরা বাইরে ট্যাক্সি নিয়ে অপেক্ষা করছে। শেয়ালদা ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে।

নজরুলের খাবার ধরে দিল সেই ছেলেটি। দেখলাম একটা ডিসের ওপর কয়েক মুঠো ভাত আর একটা প্লেটের ওপর কয়েক টুকরো মাংস আর একটু ঝোল। একটা মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

তবু নজরুল আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, খাবে?

বললাম, না। আমি খেয়ে এসেছি।

যে ডেক্‌চিতে রান্না হয়েছিল সেটাও দেখছি সামনে পড়ে রয়েছে। তাতে অবশিষ্ট কিছুই নেই। যে-ছোকরাটি রান্না করেছিল, সে একটি কাঁচের গ্লাসে জল এনে নামিয়ে দিলে নজরুলের হাতের কাছে।

তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি খাওনি তো এখনও?

সে মাথা হেঁট করে বিনম্র ভঙ্গীতে বললে, না।

বললাম, কী খাবে? কিছুই তো নেই দেখছি।

সে বললে, আমি হোটেলে খেয়ে নেব।

কথাটা নজরুলের কানে গেল। খেতে খেতে বলে উঠলো, কেন? হোটেলে খাবে কেন?

লোকটি বললে, আপনি তখন আপনার বন্ধুকে খাইয়ে দিলেন যে!

এতক্ষণে মনে পড়লো নজরুলের। বললে, ধেৎ, সে আমার বন্ধু কেন হবে? সে এসেছিল আমার কাছে টাকা ধার করতে।

বলেই আমার দিকে তাকাল নজরুল। বললে, কেমন মজা দ্যাখো। আমার নাম-টাম শুনে লোকটা ভেবেছে বুঝি আমার মেলা টাকা।

বললাম, তাই বুঝি তুমি তাকে খাইয়ে বিদেয় করলে?

নজরুল বললে. দেখলাম বেচারার মুখখানি শুকিয়ে গেছে। বললে, দুদিন ভাত খাইনি।

—তাকেও তো পয়সা দিয়ে হোটেলে পাঠিয়ে দিতে পারতে!

নজরুল বললে, দশটি টাকার একটি নোট ছাড়া আমার কাছে আর কিচ্ছু ছিল না যে!

—সেই দশ টাকার নোটটি তাকে দিলে বুঝি?

নজরুল বললে, হুঁ। ভারি লজ্জা করছিল। চেয়েছিল একশো টাকা। দিলাম দশ টাকা।

রাঁধুনী ছোকরাটিকে দেখিয়ে বললাম, এবার একে কি দেবে দাও।

নজরুল নিতান্ত অসহায়ের মত তাকালে আমার দিকে।

একটি টাকা সেই ছোকরাকে আমি দিতে যাচ্ছিলাম। সে নিলে না। বললে, টাকা আছে আমার কাছে।

নজরুলের মুখে হাসি ফুটল।

—ওই দ্যাখো, সবাইকার কাছে টাকা থাকে, আমার কাছে থাকে না, পালায়।

ছোক্‌রাটি বললে, হোটেলে আমাকে খেতে হত না। যা রান্না করেছিলাম ওতেই কুলিয়ে যেত, কিন্তু তিনজনের খাবার একাই খেয়ে ফেললে সেই লোকটা।

নজরুল ধমক্‌ দিলে।—ছি! খাওয়ার ব্যাপার ও-রকম করে বলতে নেই। খেয়েছে বেশ করেছে।

খাওয়া শেষ করে নজরুল তার হাতকাটা ফতুয়ার ওপর বাসন্তী-রঙের চাদরটি গায়ে দিয়ে চটি পরে পান চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে যাচ্ছিল। আমাকে বললে, চল তোমাকে পেঁাছে দিয়ে যাই।

বললাম, খুব হয়েছে। তুমি যাবে শেয়ালদা, আর আমি যাব উল্‌টো দিকে—বাদুড়বাগান।

নজরুল বললে, ওরা গাড়ী এনেছে তো! ট্যাক্সি।

তবে আর কি! গাড়ী যখন এনেছে, তখন আর রক্ষে নেই। এখন যদি এই মোটরে চড়িয়ে নজরুলকে জাহান্নমে নিয়ে যেতে চায়, নজরুল আপত্তি করবে না।

জীবনে তার এই একটিমাত্র সখ সবচেয়ে বেশি। এই মোটরে চড়ার সখ!

একদিন হয়েছে কি, বিকেলে শৈলেনদের বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে আমি গল্প করছি শৈলেনের সঙ্গে, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে নজরুল ঢুকল।

—দাও চারটে টাকা দাও। বাইরে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।

রাস্তায় গিয়ে দেখলাম, ট্যাক্সির ভাড়া উঠেছে পাঁচ টাকা। একটি টাকা নজরুলের পকেটে ছিল, সেই টাকাটি ড্রাইভারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছে—টাকা আনছি, তুমি দাঁড়াও।

ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে শৈলেন বললে, এই টাকাটা তোমাকে আমি ধার দিলাম। ফিরিয়ে যদি না দাও তো তোমার গলায় গামছা দিয়ে আদায় করব। তোমার শাস্তি পাওয়া উচিত। আমরা যদি বাড়ীতে না থাকতাম, কি করতে তুমি?

কি করত তার সে ভাবনা নেই। তার সেই প্রাণ খোলা হাসি হাসতে হাসতে নজরুল এসে বসলো তার নিজের জায়গায়। মানে—বসল এসে অর্গানের সামনে। শৈলেনকে বললে, তুমি তো ক্রিশ্চান ছিলে, জু হলে কবে?

শৈলেন বললে, হয়েছি তোমার জন্যে।

—তা বেশ করেছ। নজরুল বললে, সেই রানীগঞ্জ থেকে ধরলে তুমি

অনেক টাকা পাবে আমার কাছ থেকে। হিসেব করে রেখো। আপাততঃ দু'পেয়ালা চা দাও।

শৈলেন জিজ্ঞাসা করলে, দু'পেয়ালা কেন?

নজরুল বললে, লাখ পেয়ালা চা না খেলে চালাক হয় না। লাখ পেয়ালা হতে এখনও আমার দু'পেয়ালা বাকি আছে।

শৈলেন বলেছিল, লাখ পেয়ালা চা খেয়ে চালাক তুমি হবে কিনা জানি না, কিন্তু মদ্যপান যদি করতে পার তো নির্ঘাৎ তুমি মাইকেল মধুসূদন হয়ে যাবে—সেকথা আমি হলপ করে বলতে পারি।

আমাদের দুর্ভাগ্য, অনেকদিন হল শৈলেন আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। নজরুল আজ সত্তর বছরের বৃদ্ধ। সারাজীবনে সে মদ্যপান দূরের কথা, ধূমপান পর্যন্ত করলে না। কাজেই সে মাইকেল হল কিনা শৈলেন তা দেখে যেতে পারলে না।

কিন্তু নজরুল যা হয়েছে তাই-বা ক'জন হতে পারে?

যা সে পেয়েছে তাই-বা ক'জন পায়?

কবি এবং গীতিকার বলে নজরুল ইসলাম সর্বজনশ্রদ্ধেয়। দেশবাসীর কাছ থেকে পেয়েছে সে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আর প্রণতি।

আবার অন্য দিকে তার বঞ্চনার পরিমাণও কম নয়। জীবন-দেবতার কাছ থেকেও পেয়েছে সে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ আর অপরিমাণ যন্ত্রণা।

কবি-নজরুলের চেয়ে মানুষ-নজরুল অনেক—অনেক বড়ো। শিশুর মত সরল, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, নিরহংকার, নিরাসক্ত, এমন অজাতশত্রু, হৃদয়বান এবং আনন্দময় পুরুষ—এ যুগে সচরাচর দেখা যায় না।

শৈলেন একদিন হাসি-রহস্য করে বলেছিল, 'তুমি মহাদেব সেজে ছাই মেখে ব্যোম্ ব্যোম্ করে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে।'

আজ শৈলেনের সেই কথাটাই বেশি করে মনে পড়ছে। শৈলেন বলেছিল, সমুদ্রমন্থনের অমৃতটুকু নিজেরা নিয়ে বিষটুকু তুলে দেবে তোমার হাতে। সেই বিষ খেয়ে তুমি নীলকণ্ঠ হয়ে বসে থাকবে।

তাই হয়েছে। আজ শৈলেন নেই, কিন্তু তার কথাটা সত্য হয়ে গেছে। নজরুল নীলকণ্ঠ হয়ে ধ্যানমগ্ন তপস্বীর মত চুপ করে বসে আছে।

বিদ্রোহী কবি*

মন্মথ রায়

(১)

চল্ চল্ চল্
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী তল
অরুণ প্রাতের তরুণদল
চল্ রে চল্ রে চল্।
চল্ চল্ চল্॥
ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।
নব-নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।

জাতিকে নবজীবনের এই গান শুনিয়েছেন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

যদিও তিনি আজ আমাদের মধ্যেই রয়েছেন তবু দেশের চরম দুর্ভাগ্য যে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আজ তাঁর কলম আর চলে না—গানও গেছে থেমে। কিন্তু বাঙালী তাঁকে কোনো দিনই ভুলবে না। পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমায় চুরুলিয়া গ্রামে কবি নজরুল ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। নদীর সরসতা এবং পাহাড়ের কঠোরতা চুরুলিয়ার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। জন্মভূমির এই বৈশিষ্ট্য কবির চরিত্র ও রচনাতে প্রতিভাত হয়েছিল। কবির মাতার নাম জাহেদা খাতুন। পিতার নাম ফকির আহম্মদ। কবি বাল্যকালেই পিতৃহীন

---

* পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্যচিত্রের কাহিনীরূপে শ্রীমন্মথ রায় রচিত। তথ্যচিত্রের পরিচালক শ্রীমন্মথ রায় এবং গ্রন্থনা শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

হন। শৈশবের দুঃখ দারিদ্র্যে আর স্নেহ মমতার অভাবে তাঁর ভেতরে বাল্যে যে বিদ্রোহ ভাব সৃষ্টি হয়েছিল তারই সুর বেজেছে তাঁর পরবর্তী জীবনে আর সাহিত্যে। এই সেই গৃহ যেখানে কবি প্রথম ধরণীর আলো দেখেছিলেন। দশ বছর বয়সে নজরুল গ্রামের এই মক্তব থেকেই নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা পাস করেন। পাশেই নরোত্তম সিংহের গড়। কাছেই পীরপুকুরের পাড়ে ছোট একটি মসজিদে খাজেমও ছিলেন তিনি কিছুদিন। এগার বছর বয়সেই নজরুল লেটো গানের দলে ভিড়ে পড়েন। পরে তাঁকে সিয়ারসোল রাজস্কুলে ভর্তি ক'রে দেওয়া হয়।

১৯১৭র বিশ্বযুদ্ধে ৪৯ নম্বর বাঙ্গালা রেজিমেন্টের মৃত সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভ। স্কুল পালিয়ে ঐ রেজিমেন্টে নজরুলও যোগ দেন, চলে যান করাচী। নজরুলের সৈনিক জীবন করাচীতেই কাটে। হাবিলদার হয়েছিলেন তিনি। যুদ্ধের পর বাঙালী রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়া হয়। দেশে ফিরে আসেন নজরুল। কলকাতায় এসে উঠলেন ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটে—মোসলেম ভারত ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির কার্যালয়ে। 'মোসলেম ভারত' পত্রিকাতেই নিয়মিতভাবে লেখা শুরু করেন নজরুল। 'বিজলী' ও 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত হয় তাঁর যুগান্তকারী কবিতা—'বিদ্রোহী'।

বল বীর,
চির-উন্নত মম শির,
শির নেহারি আমারি নতশির ওই
শিখর হিমাদ্রির!

১৯২২ সালে তিনি ধূমকেতু সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাণী পাঠালেন—

আয় চ'লে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নি সেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন!
অলক্ষণের তিলকরেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।

আপিস হল ৭নং প্রতাপ চাটুজ্যে লেনে—যে লেনে একদা বাস করতেন 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের উদ্গাতা—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। দেশের যুব-

শক্তিকে বিদেশী-শাসনে লাঞ্ছিত দেখে শারদীয়া সংখ্যা 'ধূমকেতু'তে মায়ের কাছে অনুযোগ করলেন তাঁর এই "দামাল" ছেলে—

আর কত কাল রইবি বেটি
মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে
অত্যাচারী শক্তি—চাঁড়াল!
দেবশিশুদের মারছে চাবুক,
বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা
আসবি কখন সর্বনাশি!

বৃটিশ শাসন বরদাস্ত করতে পারলে না এই কবিতা। কবি হলেন গ্রেপ্তার। ১৯২৩ সালে ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীটের পুলিশ কোর্টে রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত কবি যে জবানবন্দী দিলেন তা চিরকালের সাহিত্য।

"রাজার পক্ষে রাজার নিযুক্ত রাজ বেতন ভোগী রাজকর্মচারী। আমার পক্ষে—সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি অন্তকাল ধরে সত্য-জাগ্রত—ভগবান্।

ঐ অত্যাচারীর সত্যপীড়ন
আছে তার আছে ক্ষয়
সেই সত্য আমার ভাগ্য বিধাতা
যার হাতে শুধু রয়।

বিচারে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হ'ল কবির। প্রথমে কবিকে রাখা হয় আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। ইতিমধ্যে তাঁর 'অগ্নিবীণা' বেরিয়েছে। প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'অগ্নিবীণা'ও দেশের মধ্যে এক অপূর্ব চাঞ্চল্য আনলে। কবির কণ্ঠে যেন কাল-ভৈরবের প্রলয়তূর্য বেজে উঠল। আলিপুরের এই সেলে অবরুদ্ধ কবি দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন। এই ফাঁসির মঞ্চ দেখেই বুঝিবা কবি পরবর্তী কালে লিখেছিলেন—

ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেলো যারা
জীবনের জয় গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা
দিবে কোন বলিদান!
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা
জাতেরে করিবে ত্রাণ।

দুলিতেছে তরি ফুলিতেছে জল
কাণ্ডারী হুঁসিয়ার,
দুর্গমগিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে
যাত্রিরা হুঁসিয়ার।

তৎকালীন কারাগারের অব্যবস্থার প্রতিবাদে কবি অনশন করলেন। তিনি গাইলেন—

কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কর্ রে লোপাট
রক্তজমাট
শিকল পুজোর পাষাণ বেদী।
ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস-নিশান
উড়ুক প্রাচী-র প্রাচীর ভেদি'।

এই সেল্-এ হাতে কড়া, পায়ে বেড়ী দিয়ে কবিকে বন্দী করে রাখা হল; কবির অনশনের সংবাদে সারা দেশ হল বিচলিত, বিক্ষুব্ধ। শিলং থেকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহী কবিকে টেলিগ্রাম করলেন—

"Give up hunger strike, our literature claims you."

কলকাতায় এক বিরাট জনসভায় জেল কর্তৃপক্ষের আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। কবিকে অনশন ত্যাগের জন্যে দেশবাসীর তরফ থেকে অনুরোধ জানানো হয়। সরকার বন্দীদের দাবী মানবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় কবি চল্লিশ দিনের দিন উপবাস ভঙ্গ করেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে তাঁর 'বসন্ত' নাটক উৎসর্গ করে তাঁকে ধন্য করেন। হুগলী জেল থেকে বহরমপুর জেলে নজরুলকে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানেও চলেছে কবির সাহিত্য-সংগীত-সাধনা। কারাগারে যে-সব গান তিনি মুখে-মুখে রচনা করেছিলেন বাইরেও তার আগুন তখন ছড়িয়ে পড়েছে।

এই শিকল পরা ছল্
মোদের এ শিকল পরা ছল্—
এই শিকল পরেই শিকল তোদের কর্বরে বিকল।

তোদের বন্ধ কারায় আশা মোদের বন্দী হতে হয়
ওরে ক্ষয় করতে আশা মোদের সবার বাঁধন ভয়।
এই শিকল বাঁধা পা নয় এ শিকল ভাঙ্গা কল,
তোমার বন্ধ ঘরের বন্ধনিতে কর্‌ছ বিশ্ব গ্রাস
আর গ্রাস দেখিয়েই করবে ভাব্‌ছ বিধির শক্তি হ্রাস।
সেই ভয় দেখানো ভূতের মোরা করব সর্বনাশ
এবার আন্‌ব মা ভৈ বিজয়মন্ত্র বলহীনের বল
তোমরা ভয় দেখিয়ে কর্‌ছ শাসন জয় দেখিয়ে নয়,
সেই ভয়ের টুঁটি ধর্‌ব টিপে কর্‌ব তারে লয়।
মোরা আপনি মরে মরার দেশে আনব পরা ভয়,
মোরা ফাঁসি পরে আন্‌ব হাঁসি মৃত্যু জয়ের কল।

(২)

এই সময় কবির "দোলন চাঁপা" প্রকাশিত হয়। মেয়াদের একমাস আগেই কারামুক্ত হন নজরুল। কারামুক্ত কবি বন্দী হলেন এই ৬নং হাজী লেনে, প্রমীলা সেনগুপ্তার সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে। এই সময় তাঁর "বিষের বাঁশী" ও "ভাঙাব গান" প্রকাশিত হয়েই বাজেয়াপ্ত হয়। এর পর কবি সপরিবার হুগলীতে গিয়ে বাসা বাঁধেন। তখন তাঁর দারুন অর্থকষ্ট। অনেকদিন অনশনে অর্ধাশনেও দিন কাটাতে হয়েছে তাঁকে। ১৯২৫ সালে শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপত্র "লাঙল" প্রকাশিত হয়। প্রধান পবিচালক ছিলেন কবি।

প্রথম সংখ্যায় প্রসিদ্ধ সাম্যবাদী কবিতাটি প্রকাশিত হয়। সাম্যবাদীর প্রধান সুর মানবিকতা। ১৯২৬ সালে লাঙলের নবরূপ হয় 'গণবাণী।'

ওরে ও শ্রমিক, সব মহিমার উত্তর-অধিকারী।
অ-লিখিত যত গল্প কাহিনী তোরা যে নায়ক তারি॥
শক্তিময়ী সে এক জননীর
স্নেহ-সুত সব তোরা যে রে বীর,
পরস্পরেব আশা যে রে তোরা মা'র সন্তাপহারী॥

১৩৩৬-এর ২৯ অগ্রহায়ণে এই Albert Hall-এ জাতির পক্ষ থেকে কবিকে সংবর্ধনা জানানো হয়। পৌবোহিত্য কবেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। কবি সেদিন বলেছিলেন, "যে কুলে, যে সমাজে যে বর্ণে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই

কবি।" ছন্দের খেলা তাঁর মনকে টেনে নিয়ে যায় সুরের রাজ্যে। এইচ.এম.ভি প্রমুখ গ্রামোফোন কোম্পানীগুলিতে রেকর্ড হতে থাকে তাঁর গান। গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডিং রুম! কবি নিযুক্ত হন এইচ.এম.ভি-র ট্রেনার। নজরুলের কবি-প্রতিভা সার্থকতা লাভ করেছে গানে। ভাবের ব্যঞ্জনায় ও সুরের বিশেষত্বে নজরুল-গীতি সুবিখ্যাত।

আমার শ্যামা মায়ের কোলে চ'ড়ে
জপি আমি শ্যামের নাম,
মা হলেন মোর মন্ত্র গুরু
ঠাকুর হলেন রাধা শ্যাম।

অতঃপর কলকাতার বেতার কেন্দ্রও গান-রচনা ও সুর-সংযোজনার প্রয়োজনে তাঁকে সাদরে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান।

নীলাম্বরী শাড়ী পরে
নীল যমুনায় কে যায কে যায় কে যায,
যেন জলে চলে স্থলো কমলিনী
ভ্রমর নূপুর হয়ে ঘোরে পায়পায়।

কবির লেখা কাব্যগ্রন্থ। এছাড়া কয়েকখানি উপন্যাস এবং নাটকও তিনি লিখেছেন। তাঁব 'আলেযা' নাটকটি নাট্যনিকেতনে অভিনীত হয়। তাঁর সর্বশেষ নাট্য-রচনা 'মধুমালা' গীতিনাট্য নাট্যভারতীতে অভিনীত হয়। নাট্যকার বন্ধুদেরও 'মহুযা, কাবাগাব, রক্তকমল প্রভৃতি বহু নাটকে' গান রচনা কবে দিযেছিলেন তিনি। ছায়াচিত্রেব সংগীত রচনাতেও তাঁর দান কম নয়। কবি তাঁর কাব্য-সংকলন 'সঞ্চিতা' উৎসর্গ করেন কবি-গুরুকে। কিন্তু মধ্যাহ্ন-সূর্যের এই দীপ্তি মেঘাচ্ছন্ন হল। এক দুর্জ্ঞেয়, দুরারোগ্য ব্যাধিতে কবি আক্রান্ত হলেন। আরো দুর্ভাগ্য যে কবিপত্নী দুরন্ত পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁদেব দুটি শিশু সন্তানও অকালে ইহলোক ত্যাগ করে। পক্ষাঘাতে অক্ষম—তবুও স্বামীকে নিজহাতে খাওয়ানোটি চাই!—কী অসহায় আজ এই দম্পতি!

বিদায়, হে মোর বাতায়ন পাশে
নিশীথ জাগার সাথী!
ওগো বন্ধুরা পাণ্ডুর হয়ে
এলো বিদায়ের রাতি।
আজ হতে হ'ল বন্ধ আমার
জানালার ঝিলিমিলি,

আজ হতে হল বন্ধ মোদের
আলাপন নিরিবিলি।

কলকাতা এবং রাঁচীতে কবির নিরাময়ের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় কবিদম্পতিকে চিকিৎসার্থ পাঠানো হয় ইউরোপে—কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। কবিদম্পতি ফিরে এলেন কলকাতায়। আরোগ্যের আশাপ্রদ খবর আর কিছু নেই। গড়িয়ে এলো ১৯৫৬ সাল। ইতিমধ্যে দুইপুত্র—সব্যসাচী ও অনিরুদ্ধের বিয়ে হয়েছে। পুত্রবধূরাও কবির সেবা করেন। কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুর উপস্থিতিতে এ-বছর কবির ঘরোয়া জন্মোৎসব। নজরুল নিজেই একদিন লিখেছিলেন—

হারিয়ে গেছো অন্ধকারে—
পাইনি খুঁজে আর,
আজকে তোমার আমার মাঝে
সপ্ত পারাবার!
আজকে তোমার জন্মদিন,
স্মরণ-বেলায় নিদ্রাহীন
হাত্ড়ে ফিরি হারিয়ে যাওয়ার
অকূল অন্ধকার
এই-সে হেথায় হারিয়ে গেছো
কুড়িয়ে পাওয়া হাব।

অন্তঃপুরেও জন্মতিথি পালিত হয়।

আমি দ্বার খুলে আব বাখবো না পালিযে যাবে গো,
জানবে সবে গো নাম ধবে আর ডাকবো না পালিয়ে যাবে গো,
এবার পূজার প্রদীপ হয়ে জ্বল্‌বে আমার দেবালয়ে
জ্বালিয়ে যাবে গো আর আঁচল দিয়ে ঢাকবো না পালিয়ে যাবে গো।

বাল্য-লীলার পটভূমিতে গেলে যদি কবিব স্মৃতি ফিরে আসে এই আশায় ১৯৫৬ সালেব জুন মাসে নজরুল সাংস্কৃতিক সমিতি সপরিবার কবিকে বর্ধমানেব চুরুলিয়া গ্রামে নিয়ে যান। কবির জননী জন্মভূমি আজ নজরুলের নিজের ভাষাতেই বল্‌ছেন—

হারিয়ে পাওয়া ওরে আমার মানিক!
দেখেই তোরে চিনেছি,
আয়, বক্ষে ধরি খানিক!
বাণ-বেঁধা বুক দেখে তোরে
কোলে কেহ না নিক্,

(ওরে) হারার ভয়ে ফেলতে পারে
চিরকালের মা কি!
ওরে আমার কোমল বুকে কাঁটা বেঁধা পাখী!
কেমন ক'রে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি?
এ যেরে তোর চির-চেনা স্নেহ,
তুই তো আমার নস্ রে অতিথ্
অতীত কালের কেহ,
বারে বারে নাম হারায়ে
এসেছিস এই গেহ।
এই মায়ের বুকে থাক্ যাদু তোর
যদিন আছে বাকি।
প্রাণেব আড়াল করতে পাবে
সৃজন দিনেব মা কি?
হাবিয়ে যাওয়া! ওরে পাগল,
সে তো চোখের ফাঁকি!

কবির থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল স্থানীয় স্কুল-বাড়ীতে। একদিন তাঁকে আদি বাড়িতে আনা হল। কিন্তু স্মৃতি জাগে কই? ছেলেবেলার বন্ধুবান্ধব প্রিয়জনদের দেখেও কি তোমার কিছু মনে পড়ছে না কবি? কথা কও! কথা কও!! কথা কও!!! নিশ্চিহ্ন এই মসজিদে সাঁঝের বাতি জ্বালাতেন যিনি আজ সেই কবিব মনেব বাতি নিভে গেছে—হে ঈশ্বর! সে বাতি তুমি জ্বালিযে দাও—জ্বালিযে দাও।

নজরুলের জীবন-দেবতা

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়

কবি নজরুল "বিদ্রোহী" কবিতা লিখবার পর মানব-জীবনে অফুরন্ত গতিবেগ ও আবেগ সঞ্চার করার প্রেরণায় চল-চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন।

তিনি চলায়, বলায়, কর্মে ও আদর্শে কুঁড়েমি, ন্যাকামিকে বরদাস্ত্ করতে পারতেন না। তিনি চেয়েছিলেন দেশের সাধারণ লোক তরুণ ও নরনারী নির্বিশেষে কর্মবীর হোক -শোষণ পীড়নের জবরদস্ত্ শত্রু হোক। ন্যায়কে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণবলি দিক, অন্যায়কে উৎখাত করুক। জীবনের প্রতিটি পথে বীর পদক্ষেপে কর্মে, প্রেমে জগতের সামনে জাতিকে উচ্চশীর্ষে গৌরবমণ্ডিত কাঁটার মুকুট পড়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়াবার শক্তি সঞ্চয় করে; তাকে সঞ্চারিত করে দিক দিকে দিকে। তিনি এই আকাঙ্ক্ষাই শুধু করেন নি, তথাকথিত বিলাসী কবিদের মত। তিনি নিজের জীবনে "আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখাবার" ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। এই ছিল তাঁর জীবন সম্বন্ধে ধ্যান। সেই ধ্যানের মূর্তিই অগ্নিময় ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর বিভিন্ন বৈপ্লবিক গানে কবিতায় রচনায়। "জীবন বন্দনা" কবিতায় তাঁর জীবনের প্রতি বন্দনার মহান্ ভাব ব্যক্ত হয়েছে—

গাহি তাহাদের গান
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।[১]

কবি প্রথমেই তাঁদের বন্দনা গাইলেন, যাঁরা মানবজাতিকে ক্ষুধায় বাঁচবার জন্য দিলেন ফসল। "অন্নব্রহ্ম" তত্ত্বের প্রথম ও প্রধানতম কথারই বন্দনা এটি। উপনিষদের গোড়ার কথাও এটিই। উপবাসী মানুষ কোন মহৎ কাজ যেমন করতে পারে না, তেমনি অতিভোজও অপদার্থ জীবন বহন করে। অথচ "ফসল" এমন একটি দ্রব্য যা প্রয়োজন মাফিক গ্রহণ করলে শরীরের শান্তি, মননশীলতা, পেশীর সবলতা, ধমনীর সুনিয়ন্ত্রিত প্রবাহ, সব মিলিয়ে বুদ্ধির ও কর্মের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়। তাকেই উপনিষদে "অন্নব্রহ্ম" বলেছেন। অতিভোজীর দল আজও এই ফসল নিয়ে ফাট্কাবাজি করে দেশে অশান্তির আগুন জিইয়ে রাখছে।

এমন যে "ফসল" তাকে যারা কঠিন মাটিকে তৈরী করে, জলের স্রোতধারায় উর্বরতার জন্য খাল কাটল, বন্যার হাত থেকে ফসল বাঁচাবার জন্য বাঁধ বাঁধল, মৃত্তিকার কঠিনতা যাদের মুষ্টির তলে বাঁধা পড়ল, যার প্রাণপণ শক্তি ও যত্নে ধরণী শস্যসম্ভার মানুষের মুখে তুলে ধরলে,—সেই শ্রম-সাধককে আর সেই অন্নকে বন্দনা জানিয়ে নজরুল গাইলেন—

শ্রম-কিনাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্দয়-মুঠি-তলে
ত্রস্তা ধরণী নজ্‌রানা দেয় ডালি ভরে ফুলে ফলে।
বন্য-শ্বাপদ-শঙ্কুল জরা-মৃত্যু-ভীষণা ধরা
যাদের সাধনে হল সুন্দর কুসুমিতা মনোহরা।
কূপ-মণ্ডুক "অসংযমী"র আখ্যা দিয়াছে যারে
তারি তরে ভাই গান রচে যাই, বন্দনা করি তারে![২]

শুধু তাই নয় বন্য হিংস্র জানোয়ারের অগম্য সেইসব জায়গাকে কব্জায় আনবার জন্য যারা লড়াই করে মানব-সভ্যতার বাগিচায় পরিণত করল; যারা এই কাজ করতে "বনের ব্যাঘ্র ময়ূর সিংহের" শক্তিকেও সায়েস্তা করে মানব-সভ্যতার প্রসারের পরেও "বর্বর" নাম নিলে, যারা প্রাণ তুচ্ছ করে বিষম বিষাক্ত ফণীর সঙ্গে লড়াই করে তাদের লোপাট করে শহর, নগর, রাজধানী প্রতিষ্ঠা করলে, অপরিমেয় প্রাণ ও জীবনীশক্তি দিয়ে, কবি তাদের বন্দনা গাইলেন—

'এল দুর্জয় গতিবেগ সম যারা যাযাবর শিশু
তারাই গাহিল নব-প্রেম-গান ধরণী-মেরীর যিশু'[৩]

এই শ্রমিকরাই যিশুর আত্মদানের মত উৎপাদন করে যুগ যুগ নিঃস্ব হয়ে চলেছে। এদের ঘর নেই; বিষয় সম্পত্তিও নেই, এরা দুটো হাতকে পরিশ্রমের যন্ত্র করে নিত্য নব নব সৃষ্টি করার দুর্বার বেগে শ্রম করে যাচ্ছে। তারাই সভ্যতার জৌলুষের গৌরবের অধিকারী। এরাই উপেক্ষিতা মেরীর মত এই ধরণীকে মহিমময়ী করেছে, দিয়েছে সম্ভ্রম। তাই নজরুল এদের বন্দনা করে আজ বিশ্বে নমস্য।

যারা অরণ্য কেটে বসাল অমরাবতী তারা তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে ঠাঁই পেল এঁদো পচা ডোবার মত দুর্গন্ধময় বস্তিতে। এই অবস্থাকে চিরস্থায়ী করতে যারা আইন করল নজরুল সেই ধনতন্ত্রী, সাম্রাজ্যবাদী-দের ছিলেন চিরশত্রু। তাই "ফরিয়াদ" কবিতায় লিখলেন—

মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ
মাটির মালিক তাঁহারাই হন?

যে যত ভণ্ড ধাড়িবাজ, আজ সেই তত বলবান্
নিতি নব ছোরা গড়িয়া কশাই বলে জ্ঞান বিজ্ঞান॥[৪]

নজরুল শুধু লিখেই সন্তুষ্ট থাকেননি, তিনি কাজের মধ্যেও ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কৃষিসমাজের উন্নতির জন্য গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরেছেন, তাদের জন্য কৃষাণের গান লিখেছেন। নিখিল-বঙ্গ ধীবর সমিতির সম্মেলনে গিয়ে তাদের মত করে গান লিখেছেন, তাদের সঙ্গে মিশেছেন। শ্রমিক সম্মেলনের গান লিখে শ্রমিকদের মধ্যে গেছেন। হুগলীতে থাকতে স্বর্গীয় বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বহু শ্রমিক সভায় গিয়েছেন। তাঁর জীবন-দেবতার মূল প্রসারিত ছিল মেহনতি মানুষের সমাজের গভীরতম প্রদেশে।

আজ আমাদেব দেশে নজরুলকে "মিষ্টিক" কবি বলে একশ্রেণীর সুধীমণ্ডলী প্রচার করছেন। কিন্তু নজরুল আজ নমস্য হয়েছেন, পূজা পাচ্ছেন মেহনতি মানুষের কবি বলেই। কবি হয়েও অত্যাচার, শোষণ, শাসনের বিরুদ্ধে নিজেকে ধনীর হাতে বিক্রয় করে না দিয়ে, দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম কবেছিলেন। সেই কথাটা আজ মেহনতি সংস্থাগুলি ও আমাদের প্রিয় সরকারকে তরুণদেব ও জনগণের মধ্যে পুনঃপ্রচার করে কবির আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিষ্ঠা কবতে হবে আব মেহনতি শ্রেণীকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে হবে—আর শোষকশ্রেণীব বিলোপেব সংগ্রামে নজরুল সাহিত্যকেও একটি হাতিয়াব হিসাবে নিতে হবে।

১, ২, ৩ জীবনবন্দনা—সন্ধ্যা পৃষ্ঠা ৪
৪ ফবিযাদ—সর্বহাবা পৃষ্ঠা ২০

'ব্যথা বিষে নীলকণ্ঠ কবি'

রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত

কাজী নজরুল ইসলামের কবি-ব্যক্তিত্ব স্বাতন্ত্র্যে সুচিহ্নিত। তখন রবীন্দ্রপ্রতিভা মধ্যাহ্নদীপ্তিতে ভাস্বর, অথচ আবির্ভাব মাত্রেই নজরুল বাঙালী পাঠকদের হৃদয় জয় করে নিলেন। অনেক জনপ্রিয় লেখকই সমকালের হাততালি কুড়িয়ে জীবনের অন্তিম প্রহরে লক্ষ্য করেন, পাঠকসমাজ তাঁকে ছাড়িয়ে অন্যপথে অগ্রসর। কিন্তু নজরুল সাময়িক জীবনের কবি-ভাষ্যকার হয়েও চিরকালের কবি। কারণ মানুষের বেদনার বহ্নি-জ্বালাই তাঁর কাব্যৈকজীবিত। গভীর আবেগময় ভালবাসাই সে জ্বালাকে তীব্রতর করেছে।

কিন্তু নজরুলের কবিতা হাতে নিয়ে মনে হয়, ওয়ার্ডস্বার্থের কাব্যসংজ্ঞা সর্বাংশে সত্য নয়। আবেগের নির্জন স্মৃতিচর্বণাই কি কবিতার একতম উৎস? একথা ঠিক, নজরুলেব সহানুভূতি, তীব্র বেদনাবোধ তাঁর কাব্যে এনে দিয়েছে প্রবল উষ্মা, উত্তেজনা, কখনো বা ক্ষোভে ফেটে-পড়া মানুষের সমবেত কলরব। বাগ্মিতাব সঙ্গে কবিতার প্রভেদচিহ্ন প্রায় লুপ্ত। তবু কবিতা কি Memorable Speech নয়?

আবেগের অব্যবহিত প্রকাশে হয়ত তীব্রতা, উদ্দামতা বেশি থাকে, অন্যায়ের প্রতিবাদে যে ক্রোধ, অত্যাচারী শোষকের বিরুদ্ধে যে ঘৃণা তার কাব্যত্ব অস্বীকার করা যায় না। তাহলে কাব্যপরিধিই সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। নজরুল-কাব্যের honest anger বাংলা কবিতায় নতুন ঐতিহ্যস্রষ্টা।

কাব্যনামেই নজরুলের কবি-ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য সুপরিস্ফুট। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সরস শ্যামল বাংলা কাব্যে মরীচিকা, মরুমায়া, মরুশিখা আমদানি করেছেন, নজরুলের অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী, ভাঙার গানে যে বিদ্রোহচেতনা, সর্বহারা-প্রলয়শিখা-চন্দ্রবিন্দুতে তারই পরিণতি। ফণি-মনসা ও জিঞ্জীরেও সামাজিক অসাম্য অত্যাচারে পীড়িত নজরুল ইসলামের রুদ্ধ আর্তস্বর শোনা যায়। নজরুল-কাব্যে যদিও একাধিক সুর লভ্য, তবু আর্ত মানবতার বিদ্রোহের সুরটিই প্রধান। তাই 'শায়কবেঁধা পাখী' নজরুল কবি-মানসের প্রতীক।

ওরে মানিক! এ অভিমান আমায় নাহি সাজে—
তোর জুড়াই ব্যথা আমার ভাঙা বক্ষপুটে ঢাকি।
ওরে আমার কোমল-বুকে কাঁটাবেঁধা পাখী,
কেমন করে কোথায় তোরে আড়াল দিয়ে রাখি?

ঘন দুর্যোগের দিনে ধূলিলুণ্ঠিত একটি শায়ক-বেঁধা পাখীর জন্য কবিচিত্ত মমতায় বিগলিত, তাঁর অন্তরে 'চিরকালের মা' অশ্রুবর্ষণে কাতর। এই সর্বব্যাপী সমবেদনাই নজরুলের কবিতাকে কখনো বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ, কখনো প্রতিবাদে মুখর, কখনো বা ক্রোধে উদ্দীপ্ত করেছে। তাই সমবেদনাসূত্রে তিনি আদিকবি বাল্মীকিরই যোগ্য উত্তরাধিকারী।

'আমার কৈফিয়ৎ' সমগ্র নজরুল কাব্যেরই যথার্থ প্রস্তাবনা। কেন তাঁর কাব্যে ললিত-মধুরেব অর্চনা নেই, কেন সংহত আবেগের চেয়ে উচ্ছ্বাস প্রবল, কেন তিনি বিদ্রূপে পরুষ, রোধে তীক্ষ্ণ—তার পরিচয় এই কবিতাটির ছত্রে ছত্রে উৎকীর্ণ।

বন্ধু গো আর বলিতে পারি না বড় বিষজ্বালা এই বুকে,
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা,
তাই লিখে যাই এ রক্তলেখা,
বড়ো কথা বড়ো ভাব আসে নাক' মাথায়, বন্ধু, বড়ো দুঃখে।
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে।

'যুগের হুজুগ' কেটে গেলে যদি সমালোচকের উন্নাসিক বিচারে তিনি অকিঞ্চিৎকর বলে গণ্য হন, তা হলেও খেদ নেই। তবু যারা মিথ্যার বেসাতি করে, স্বরাজের নামে চাঁদা নিয়ে 'পোড়া বার্তাকু' আনতে চায়, তাদের ধৃষ্টতায়, শঠতার রাজনীতিতে কবির ক্রুদ্ধ বিবেক গর্জে ওঠে। সেই ক্রোধ-ক্ষোভের জ্বালা হয়ত তাঁর কাব্যকলাকে রসের পরনির্বৃতিলোকে উত্তীর্ণ হতে দেয় নি, কিন্তু তাঁর বলিষ্ঠ কবি-ব্যক্তিত্বের সেই আর্তি, সেই sincere মুক্তিমন্ত্রোচ্চারণ মুগ্ধ হয়ে শোনবার মত।

দোহাই তোদের! এবার তোরা সত্যি করে সত্যি বল্।
ঢের দেখালি ঢাক্ ঢাক্ আর গুড়্ গুড়্, ঢের মিথ্যা ছল।
এবার তোরা সত্যি বল্।
বুকের ভিতর ছ-পাই ন-পাই, মুখে বলিস স্বরাজ চাই,
স্বরাজ কথার মানে তোদের ক্রমেই হচ্ছে দরাজ তাই।

রাজনীতির সঙ্গে কাব্যকলার এমন ঘনিষ্ঠ সাযুজ্য তাঁর পূর্বে আর কোনো বাঙালী কবি স্থাপন করেন নি। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রবন্ধ,

বক্তৃতা এবং স্বদেশী গানগুলির কথা মনে রেখেও একথা বলা যায়। হিন্দুমেলা, বঙ্গভঙ্গ, রাখীবন্ধন, বক্সাদুর্গে বন্দীদের প্রতি সহানুভূতি, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা প্রভৃতি ঘটনা অবিস্মরণীয়। 'আমরা পথে পথে যাব সারে সারে', 'ওদের আঁখি যতই শক্ত হবে, মোদের আঁখি ফুটবে', 'বাংলার মাটি বাংলার জল', 'আগে চল আগে চল ভাই' গানের অজস্র প্রবাহে রবীন্দ্রনাথের যুগসচেতন মনের পরিচয় আছে। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের যুক্তিহীন আতিশয্য কবিকে পীড়িত করেছিল। তাই তিনি অত্যুৎসাহের রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ালেন। কিন্তু নতুন যুগ পেল নতুন চারণকবিকে। সেই কবি কাজী নজরুল ইসলাম। রবীন্দ্রভক্ত নজরুল বিশেষতঃ স্বদেশী গানে রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। তাঁর 'এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল', 'নমো বাঙ্‌লা', 'চলরে চপল তরুণদল', 'জাগো দুস্তর পথে নবযাত্রী', 'বাজাও প্রভু ঘন বাজাও' গানগুলিতে রবীন্দ্রনাথের ছায়া দুর্লক্ষ্য নয়। অবশ্য 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর্‌' 'কারার ঐ লৌহকপাট', 'বল্‌ নাহি ভয় নাহি ভয়', 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু', 'ভারত ভাগ্যবিধাতার বুকে গুরু লাঞ্ছনা পাষাণভার', 'বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ' প্রভৃতি গানে নজরুলেব নিজস্ব দৃপ্তভঙ্গি ও বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয় পাই।

॥ দুই ॥

প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ তারুণ্যকে জয়পত্র দিযেছেন 'সবুজের অভিযান' কবিতায় ঃ

বক্ত আলোর মদে মাতাল ভোবে
আজকে যে যা বলে বলুক তোবে
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।

—এই প্রমত্ত, জীবন্ত, প্রচণ্ড, অমর কাঁচাকে কবি দায়িত্ব দিয়েছেন—'ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে ভুলগুলি সব আন্‌রে বাছাবাছা।' কাজী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথ-ঈপ্সিত সেই দুবন্ত প্রচণ্ড যৌবনশক্তির কবি। আমাদের ধর্মে, রাষ্ট্রিক চেতনায়, কাজে ও কথায় কত মিথ্যাব বেসাতি, আত্মপ্রবঞ্চনা, কত ভুল বহুদিন ধরে সঞ্চিত হয়েছে, নজরুলের 'ধূমকেতু'র পুচ্ছতাড়নে সে-সব গ্লানির দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়েছে, লেগেছে লড়াই 'মিথ্যা এবং সাঁচায়'। সবুজের অভিযানের প্রত্যাশাপূরণ

নজরুলের দ্বারা সম্ভব, কবির এই বিশ্বাসের পরিচয় পাই 'ধূমকেতু'র আশীর্বাদে।

আয় চলে আয়রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু
প্রলয়ের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দেরে বিজয়কেতন।

'ধূমকেতু' পত্রিকা দীর্ঘদিন চলে নি। কিন্তু সেই বিক্ষুব্ধ দিনগুলিতে সে যে অন্ধকার দীর্ণ কবে বিশ্বাসের অগ্নিসেতু রচনা করেছিল, তার পরিচয় 'রুদ্রমঙ্গল', 'দুর্দিনের যাত্রী' গ্রন্থে বিধৃত আছে। সাংবাদিক ও কবি নজরুলের অন্বিষ্ট এক।

সাময়িক ঘটনাকে আশ্রয় কবে তাঁর পূর্বে অনেকেই কবিতা লিখেছেন। বিশেষতঃ স্মরণীয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। অবশ্য তাঁর সব কবিতা নজরুলের পূর্ববর্তী নয়। বঙ্গভঙ্গপর্বে সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যে আত্মপ্রকাশ করেন 'সন্ধিক্ষণ' হাতে নিয়ে। তারপব স্বর্গাদপি গরীয়সী, রাজা-কারিগর, দুর্ভিক্ষের ভিক্ষা, নাগ-বাঘ প্রভৃতি কবিতায় তাঁর সমাজ-সচেতন কবিমানসের পরিচয় প্রস্ফুট। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ যে-অর্থে সাময়িকতার কবি, নজরুলকাব্যের সাময়িকতা সে-সূত্রে আলোচ্য নয়। কারণ বৈচিত্র্যপ্রিয় সত্যেন্দ্রনাথের জীবনে পরাধীনতার মর্মবেদনা, দারিদ্র্য, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শোষণ এমন গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে নি, যার উৎসমুখে আবেগের প্রকাশ হয আগ্নেয়, জ্বালাময়। সত্যেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বিষযের কবিতাগুলি তাৎক্ষণিক—passing phase মাত্র, তাই সর্বদা তিনি ভঙ্গুর ধ্বনিমোহে মুগ্ধ। তাঁর কবিমনের প্রকৃত মুক্তি ঘটেছে পাল্কীর গান, পিয়ানোর গানে, লাল পরী-নীল পরী-সবুজ পরী-জর্দা পরীর জগতে। আর আর্ত মানুষের বেদনাব জ্বালাই নজরুলের কাব্যপ্রেরণার উৎস।

এই যন্ত্রণার সূচীমুখে বিদ্ধ সংবেদী কবিহৃদয় তাই প্রথাগতভাবে কল্পনার অমরাবতীতে বসে সৌন্দর্যস্বপ্ন দেখে নি। যেখানে 'জননী মাগিছে ভিক্ষা ঢেকে রেখে ঘরে ছেলের লাশ', স্বরাজের নামে 'কত শত কোটি ক্ষুধিত শিশুর ক্ষুধার গ্রাস' অপহৃত হয়, যেখানে ভীত মধ্যপন্থী স্ববিরোধে অস্থির, সেখানে নজরুলের মত বিদ্রোহী কবির কাব্যে প্রচণ্ড উষ্মা, ক্রোধ ও ব্যঙ্গই স্বাভাবিক। কিন্তু তিনি কখনোই সুস্থ বুদ্ধি খুইয়ে বসেন নি। এরও পেছনে সক্রিয় তাঁর সকল মানুষের সঙ্গে সমান আত্মীয়তা। ১৯২৬-এর দাঙ্গায় যখন অনেকে বিচার-বিবেচনা হারিয়ে

বিমূঢ়, তখন নজরুল সেই অশুভ সংঘাতের গর্ভেই মহান প্রতিশ্রুতি লক্ষ্য করেছেন:

মাভৈঃ মাভৈঃ, এতদিনে বুঝি জাগিল ভারতে প্রাণ,
সজীব হইয়া উঠিয়াছে আজ শ্মশান গোরস্থান!
ছিল যারা চির মরণ-আহত,
উঠিয়াছে জাগি ব্যথা-জাগ্রত,
'খালেদ' আবার ধরিয়াছে অসি, অর্জুন ছোঁড়ে বাণ।
জেগেছে ভারত, ধরিয়াছে লাঠি হিন্দু-মুসলমান।

যে-লাঠি মন্দির মসজিদ ভাঙতে উদ্যত, তাতেই অচিরে 'শত্রুদুর্গ গুঁড়া' হবে। চরম বিপদের দিনেও কবির সুস্থ অনসূয় বুদ্ধি 'বিজয়কেতন' উড়িয়েছে। 'ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন স্বর্ণলঙ্কা পুড়া!' রবীন্দ্রনাথ 'জীর্ণজগতে জন্মগ্রহণ' করেন নি, তাঁর পক্ষে চিত্তরাজ্যে 'বুদ্ধির স্বরাজ' প্রতিষ্ঠা করা সহজ। অশিক্ষিতপটু গ্রাম্য বালকের হঠাৎ শহরে-আসা, যুদ্ধে যোগদান এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও কবিতাচর্চায় সুস্থ বিবেকের নির্দেশ মান্য করা সত্যি বিস্ময়কর। ঈশ্বরগুপ্তসুলভ স্ববিরোধী ভাবনার দ্বন্দ্বই বরং প্রত্যাশিত ছিল। কালীর নামে গীতা হাতে নিয়ে হিন্দুর স্বদেশোদ্ধার ব্রতে মুসলিম কবি যোগ নাও দিতে পারেন, খিলাফতেব সঙ্গে মধ্য-এশিয়ায় ইসলামশক্তির নবজাগরণে যে সাম্প্রদায়িকতার সূত্র ছিল, তার মধ্যে নজরুল ইসলামের জড়িয়ে পড়াও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু মৃত্তিকানিষ্ঠ বাস্তব জীবন-বোধের অধিকারীরূপেই তিনি জেনেছিলেন, মানুষের মুক্তি ধর্মের মধ্যে নেই।

॥ তিন ॥

অনেকে বলেন, নজরুল পরাধীন ভারতের বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের চারণকবি মাত্র। চারণকবি মুকুন্দদাসের সঙ্গে তাঁর প্রকৃতির মিলটুকুও লক্ষণীয়। দুজনেই পল্লীবাংলার সাধারণ মানুষের অন্তরঙ্গ, দুজনের কাছেই কালী পরাধীন জাতিকে শক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করার উপায়। নজরুলের 'জাতের নামে বজ্জাতি সব' এবং 'ঘোররে আমার সাধের চরকা ঘোর্' গান দুটি মুকুন্দদাস তাঁর নাটকে যোগ করেন। এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও নজরুল ইসলামের কবিতা ভিন্নতর নিরিখে বিচার্য। যিনি বাঙালীর জন্য 'আন্তর্জাতিক সংগীত' রচনা করেন, দাঙ্গার আত্মক্ষয়ী অন্ধকারে যিনি

মৃত শহীদের নামে প্রশ্ন করেন, ‘আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ’, বৃটেনের শ্রমিক ধর্মঘট (১৯২৬) যাঁকে বিশ্বশ্রমিকচেতনায় উদ্দীপিত করে, তিনি অবশ্যই সজ্ঞানতঃ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন কবি। ‘লাঙল’ সম্পাদনা, কৃষক-প্রজা-মজদুর দলের সংগঠন, সাম্যবাদের আদর্শ কবি নজরুলকে বেদনা-নিরসনের মন্ত্র দিলে। ‘সর্বহারা’ সেই শৃঙ্খল-মুক্তির কবিতা-সংকলন।

কিন্তু যে-কবি জাহান্নমের আগুনে বসেও ‘পুষ্পের হাসি’ হাসেন, ‘অশ্রুপাথার হিম পারাবার পারায়ে’ ‘কুজ্ঝটিকার ঘোমটা-পরা’ দিগন্তরে দাঁড়ানো পৌষের ছবি আঁকেন, কিংবা যাঁর মন-মৌমাছি ‘ঘাসের ফুলে মটরশুঁটির ক্ষেতে’ মগ্ন হয়ে দেখে—‘কাশবনে কে শ্বাস ফেলে যায়, বাবলা ফুলে নাকছাবি তার, গায় শাড়ী নীল অপরাজিতার’—তাঁর শান্ত সুকুমার সৌন্দর্য আস্বাদনের শক্তি অনস্বীকার্য। কিন্তু কেন তাঁর সৌন্দর্যস্বর্গ ভেঙে গেল? তার উত্তর আছে ‘দ্বীপান্তরের বন্দিনী’ কবিতায়।

> পূজাবী, কাহারে দাও অঞ্জলি? মুক্তভারতী ভারতে কই?
> আইন যেখানে ন্যায়ের শাসক, সত্য বলিলে বন্দী হই,
> অত্যাচারিত হইয়া যেখানে বলিতে পারি না অত্যাচার,
> যথা বন্দিনী সীতা সম বাণী সহিছে বিচার-চেড়ীর মার।

সেজন্যই কবিকণ্ঠ সংগীতহারা, অপমানিত বিবেকের কশাঘাতে জর্জর। ‘কে জানিত কালে বীণা খাবে গুলি, বাণীর কমল খাটিবে জেল!’ নজরুল কখনোই একান্তভাবে নৈতিবাচনের শিল্পী নন। তিনি ‘নবসৃষ্টির মহানন্দে’ ‘অধীন বিশ্ব’কে উপড়ে ফেলতে চেয়েছেন। তিনি শুধু ‘ভাঙার গান’ লেখেন নি। শোষণ-পীড়নমুক্ত মানবসমাজের যে জ্যোতির্ময় স্বপ্ন নজরুল দেখেছিলেন, বাস্তব পরিবেশ ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। চোখের সামনে ব্যাপ্ত দারিদ্র্য শোষণ অপমান গ্লানির ক্লিন্ন সংসার। তাই সাইক্লোন, ঘূর্ণি, প্রলয় হয়েছে কবিচিত্তের উপমান। তিনি ‘যত অবমানিতের মরমবেদনা’-র রূপকার; তাই ‘বিশ্বতোরণে মানববিজয় বৈজয়ন্তীকেতন’ প্রতিষ্ঠা তাঁর কাব্যসাধনার পরম লক্ষ্য।

‘লাথি মার্, ভাঙ্‌রে তালা’, ‘চালা হাতুড়ি শাবল চালা’, ‘বিধির বিধান ভাঙিয়াছি আমি এমনি শক্তিমান’ কবিতার উদ্ধৃত মনোভাব এবং কালাপাহাড়, চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুর, নাদির শা, গজনী মামুদ তাঁর প্রার্থিত প্রতীক হওয়া সত্ত্বেও নজরুলকাব্য স্বধর্মভ্রষ্ট নয়। ‘নিন্দাবাদের বৃন্দাবনে’ এই নামগুলি প্রথাবিরোধী দুর্মদ প্রাণশক্তির প্রতীকে রূপান্তরিত।

'সুন্দরের এই অপমান' দেখেই কবি 'যুগান্তরের খড়্গপাণি'কে আহ্বান জানিয়েছেন। বাস্তব জীবনের বিকার বারে বারেই তাঁর সুন্দরবোধকে পীড়িত করেছে।

আমার নয়ন
আমারি সুন্দরে করে অগ্নি বরিষণ!...
স্বপ্ন যায় টুটি
সুন্দরের, কল্যাণের।...
দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি। কে বাজাবে বাঁশি
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি?

তবু কখনো তাঁর অন্তরে সুন্দরের ধ্যান হারিয়ে যায় নি, কখনো জীবন-যুদ্ধে দারিদ্র্য-অনটনের অন্তরায়ের কাছে, জঠরের কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি। কবি আগামী কালের পদধ্বনি শুনেছেন, 'সিক্ত যাদের সারা দেহমন মাটির মমতারসে, এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরই বশে।' তাই 'জীবন-বন্দনা' স্বভাবতঃই মেহনতী মানুষের বন্দনায় আরব্ধ।

গাহি তাদের গান—
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।
শ্রম-কিণাঙ্ককঠিন যাদের নির্দয় মুঠিতলে
ত্রস্তা ধরণী নজরাণা দেয় ডালি ভরে ফুলে ফলে।

'প্রলয়োল্লাস'-ও কবির বিশিষ্ট সৃজনোল্লাসেরই প্রকাশ। প্রলয়ের মধ্য দিয়ে যে নবীনের আবির্ভাব, তার লক্ষ্য—'জীবনহারা অ-সুন্দরে করতে ছেদন'। নতুনের 'সৃজন-বেদন' তার অন্তরে, 'ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর'।

॥ চার ॥

যুগাবতার, মহাদেবতা, মহারুদ্র, কালীয়দমন, তুরীয়ানন্দ, আত্মশক্তি প্রভৃতি শব্দ অধ্যাত্মবিশ্বাসীর কাছে সুপরিচিত। এই ধরনের শব্দপ্রয়োগ এবং বহুতর পৌরাণিক উপমা, রূপক, উল্লেখ নজরুলকাব্যের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। তবু কবি প্রচলিত অর্থে মিস্টিক বা অধ্যাত্মবাদী ছিলেন না। আপন অন্তরাবেগের কাব্যসৌন্দর্যমণ্ডিত রূপ দিতে গিয়ে কবি

পুরাণের শরণাপন্ন হয়েছিলেন মাত্র। এখানে মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর কবি-স্বভাবের ঐক্যটি স্মরণীয়। অবশ্য পার্থক্যও সুস্পষ্ট। হিন্দু-ধর্মানুগত না হলেও মধুসূদন অদৃষ্টবাদী, অধ্যাত্মবিশ্বাসী কবি; নজরুল ইসলাম সর্বদা 'আত্মশক্তি' উদ্বোধনে আগ্রহী।

আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি একি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!

আমি সহসা আমারে চিনেছি আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!

'সোঽহং'তত্ত্ব নয়, পুরুষকার-আমিই কবির অন্বিষ্ট। পরমার্থবাদীর 'আত্মানং বিদ্ধি'র সঙ্গে শাব্দিক সাদৃশ্য মাত্র আছে। তাই মোহিতলালের 'আমি' প্রবন্ধের সঙ্গে ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার নৈকট্য যত বেশী, নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার সঙ্গে ভাবের দূরত্ব ঠিক ততখানি।

॥ পাঁচ ॥

যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলালের কাব্যেও ধর্মের ভণ্ডামি, সমাজের দুর্নীতি প্রথার জগদ্দল পাথরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আছে, কিন্তু কেউ সমাজের আমূল পরিবর্তন বা সমাজবিপ্লব কামনা করেন নি। নজরুলের দৃষ্টি মেহনতী মানুষের জাগরণের দিকে সাগ্রহে নিবদ্ধ ছিল। তাই কৃষকপ্রজাস্বরাজ সম্প্রদায় ও কমিউনিস্ট পার্টি-সংগঠকদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সংযোগ ছিল। আদি-পিতা ভগবানেব দববারে 'ফরিয়াদ' জানানো নিষ্ফল, তাই 'জয় জনগণউত্থান! জয় নব-অভিযান' ধ্রুবপদে কবিতার উপসংহাব। নজরুল ইসলাম প্রচলিত অর্থে উত্তম অধীতি কবি নন; বিদ্যায়তনেব পরিধি থেকে বিশেষ জ্ঞানের আলো তিনি পান নি। তবু বিপ্লবের মধ্যেই যে কালান্তরের সূচনা এবং কেবল সেই পথেই 'অনশনবন্দী' লাঞ্ছিত মানুষের মুক্তির সংকেত, নজরুলের কবিতায় তার দৃঢ়প্রত্যয় উৎকীর্ণ। পরবর্তীকালের অনেক বাঙালী কবিই মেহনতী মানুষের মুক্তিসংগ্রামকে কবিতায় স্থান দিয়েছেন, তাঁরা সকলেই কমবেশী নজরুল ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত। প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, দিনেশ দাসেব কবিতায় নজরুল ইসলামেব উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যদিও নজরুল শেষ পর্যন্ত অপর্যাপ্ত প্রতিশ্রুতির, উজ্জ্বল সম্ভাবনার বিশিষ্ট কবি, তবু বলিষ্ঠ প্রাণশক্তি ও সহজাত কবিত্বগুণে রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি তিনিই দ্বিতীয় কবি-ব্যক্তিত্ব, যাঁর সঙ্গে তৃতীয় ব্যক্তির স্থান-ব্যবধান সামান্য নয়।

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম

কল্পতরু সেনগুপ্ত

তারুণ্যের উজ্জ্বলতায়, যৌবনের উচ্ছ্বাসে, অগ্নিবীণার ঝঙ্কারে, প্রেমভক্তির অনুরাগে কাজী নজরুল ইসলাম বাঙালীর জীবনে জাগিয়েছিলেন নতুনের স্বপ্ন, তুলেছিলেন নতুন জীবনতরঙ্গ। অগ্নিবীণায় গান গেয়ে বাঙলার তরুণমনে বিপ্লবের প্রেরণা সৃষ্টি করেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ থেকে শৃঙ্খলমুক্তির আহ্বান শুনিয়েছিলেন। তিনি মুক্তিসংগ্রামের কবি; বিদ্রোহীকবি নজরুল ইসলাম। বাংলার সাহিত্য-গগনে ঝড়ের মত এই কবির আবির্ভাব। তাঁর বৈশাখী ঝড়ের কাব্য বাঙালীর জীবনে বিদ্যুৎঝলকে পথের নিশানা দিয়েছিল। সেদিন তরুণ বাঙালী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে এই বিদ্রোহীকবির রচিত গান গেযে অথবা কবিতা আবৃত্তি করে ফাঁসির মঞ্চে উঠেছিলেন।

কাজী নজরুল ইসলামের স্বদেশ চেতনা এবং বিদ্রোহের বাণী কেবল ভাবোচ্ছ্বাস নয়। নভেম্বব বিপ্লবেব প্রেবণায় স্পষ্ট করে তিনি পথের নিশানা তুলে ধরেছিলেন। স্বাধীনতা বলতে তিনি কেবলমাত্র ইংরেজের হাত থেকে দেশের বড়োলোকদেব হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর বুঝেন নি, একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের আরো বেশী মুনাফার পথ করে দেওয়া এবং সামন্ত জমিদারদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষাকারীদের শাসন-ক্ষমতা লাভের কথা মনে করেন নি, অথবা কেবলমাত্র মধ্যবিত্তদের সুযোগ সুবিধা লাভের কথা চিন্তা করেন নি। বরঞ্চ এরূপ চিন্তা যারা করেছেন তাদের থেকে তিনি দূরে ছিলেন, তাদের ঘৃণা করেছেন। স্বাধীনতার অর্থে বিদ্রোহী কবি জানতেন শোষিত মানুষের মুক্তি এবং মেহনতি মানুষের রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ।

তাঁর এই চিন্তাধারা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে কাব্য, সংগীত, সাংবাদিকতা এবং সংগঠনমূলক কাজে। তাঁর প্রথম যুগের কবিতা ও গানে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী চেতনা, গভীর দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতা। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লববাদী প্রচেষ্টায় তিনি বিশ্বাসী। বাংলার বিপ্লববাদী আন্দোলনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা

উপলব্ধি করে লিখেছেন : 'আমরা শক্তি আমরা বল, আমরা ছাত্র দল।' যে গান ছাত্র সমাজকে সংঘবদ্ধ করেছে, বিপ্লবচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছে। 'কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কররে লোপাট'...'লাথি মার ভাঙরে তালা! যতসব বন্দীশালা—আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা, ফেল উপারি।' অথবা 'এই শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল', গানগুলি বিপ্লববাদী আন্দোলনের রণধ্বনি হয়ে উঠেছিল। বিপ্লববাদী চিন্তা-ধারাকে আরো পরিপুষ্ট করে তাঁর রচিত : 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুঁসিয়ার!' বাংলা ভাষায় ও বাঙালীর সুরে এ এক নতুন ধরনের কোরাস সংগীত। এরই সঙ্গে তিনি বাঙালীকে দিয়েছেন মার্চ সংগীত : 'চল্ চল্ চল্, ঊর্ধ্বে গগনে বাজে মাদল নিম্নে উতলা ধরনীতল, অরুণ প্রাতের তরুণ দল চলরে চলরে চল॥' এই গানগুলি দেশপ্রেমের গভীরতা ও জঙ্গী অনু-প্রেরণায় বিশ ও ত্রিশ দশকের যুবকদের ঘরের বার করে এনেছিল; যুবকদের মনে স্বাধীনতা সংগ্রামের উন্মাদনা জাগিয়েছিল। ত্রিশ দশকে জেলখানায় শুনেছি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত দেশপ্রেমিকের কণ্ঠে গান : "ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয় গান, আসি অলক্ষ্যে দাঁড়িয়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান?"

কাজী নজরুলের 'বিদ্রোহী' (১৯২১) বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব কবিতা। এমন শক্তিশালী উন্মাদনাপূর্ণ কবিতা বাংলায় রচিত হয়নি। দুনিয়াটাকে পাল্টে দেবার, পুরাতন সমাজ, সংস্কার ভেঙে ফেলার সংকল্পের শেষে বলা হয়েছে : 'আমি সেইদিন হব শান্ত, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না, অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না,' এই অভিব্যক্তিতে রয়েছে শোষণ-হীন সমাজ গঠনের কথা, যা একমাত্র সম্ভব শ্রেণীশোষণহীন সমাজ গঠনে; সাম্যবাদী সমাজে। কাজী নজরুলের প্রারম্ভিক পর্যায়ের লেখা 'ব্যথার দান' (১৯২২ সালে প্রকাশিত)-এ দেখা যায় রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাব। গল্পটি প্রেমের হলেও তার মধ্যে রয়েছে দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতা। বিশ দশকের মাঝামাঝি সময়ের তাঁর লেখার মধ্যে সাম্যবাদী চিন্তাধারা স্পষ্টতঃ লক্ষণীয়। সাম্যবাদী, কবিতাগুচ্ছ, প্রলয়োল্লাস, সব্যসাচী, কৃষকের গান—'উঠ রে চাষি জগৎবাসী ধর কসে লাঙল'; শ্রমিকের গান—'ওরে ধ্বংস পথের যাত্রী দল ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল,' ইত্যাদি গানের সঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁর কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল সঙ্গীতের অনুবাদ : 'জাগো অনশন-বন্দী,

উঠরে যত জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত॥...এই "অন্তরন্যাশনাল-সংহতি"রে হবে নিখিল মানব-জাতি সমৃদ্ধত' (গণবাণী—১৯২৭)। ভারতে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল সঙ্গীতের প্রথম অনুবাদের গৌরব কাজী নজরুল ইসলামের। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতার বিখ্যাত 'রেড ফ্ল্যাগ' গানটিরও ভারতে প্রথম অনুবাদক কাজী নজরুল। 'ওড়াও ওড়াও লাল নিশান! দুলাও মোদের রক্তপতাকা' (গণবাণী—১৯২৭)। আজো রক্ত পতাকা উত্তোলনের সময় এই গানটি গাওয়া হয়। এই গানটি শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে অপূর্ব অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে; এবং বাংলায় শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন সংগঠনে এই গানটিরও বিশেষ ভূমিকা আছে।

কাজী নজরুলের সমাজ বিপ্লবী চিন্তাধারা আরো প্রকাশিত হয়েছে 'নবযুগ' 'ধূমকেতু' 'লাঙল' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রবন্ধে। সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ'-এ কাজী নজরুল ইসলাম ও কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। সাংবাদিকতায় নজরুল যেমন অসাধারণ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন, সেই সঙ্গে সমাজ বিপ্লবী চিন্তাধারায় বলিষ্ঠ প্রবন্ধগুলি শুধুমাত্র কালের সীমায় আবদ্ধ নেই।

কাজী নজরুল ইসলামেব কাব্য. সংগীত ও সাংবাদিকতায় এই সমাজ বিপ্লবী চেতনার প্রকাশ ঘটল কি করে? সেকালে আব কোন কবি ও সাহিত্যিক এমন খোলাখুলিভাবে সাম্যবাদের কথা বলেন নি। নজরুলের 'ব্যাথার দান'-এ লাল ফৌজের ও রুশ বিপ্লবের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। এই সমাজ বিপ্লবী প্রেরণা তিনি সৈনিক জীবনে লাভ করেছিলেন। সৈনিক ব্যারাকে তিনি গোপনে রুশ বিপ্লবেব পত্র-পত্রিকা পাঠ করেছেন এবং অন্যান্যদের পড়িয়েছেন ও আলোচনা কবেছেন। এসব কথা কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ রচিত 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা' বইতে আলোচিত হয়েছে। স্কুল জীবনে নজরুল সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সম্পর্ক লাভ করেছিলেন; সৈনিক জীবনে তাঁব দেশপ্রেম আন্তর্জাতিকতা-বোধ ও সমাজ-বিপ্লবী জীবন দর্শনে বলিষ্ঠ হয়ে উঠে। সৈনিক জীবন থেকে ফিরে এসে ১৯১৯ সাল থেকে তিনি ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের অন্যতম প্রথম সংগঠক কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে একই বাড়িতে দীর্ঘদিন বাস করতে থাকেন। স্বভাবতই কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে নজরুলের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আলোচনা হয়েছে। এই সময়েই নজরুলের অধিকাংশ বিখ্যাত রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। একসঙ্গে দু-জনে পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, এবং গণ-আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন। কাজী নজরুলকে কলকাতায় রাখার ব্যবস্থা থেকে

পরবর্তী কালে নজরুলের বিবাহের পরেও কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ ও কমরেড আবদুল হালিম এই পরিবারের সব সময়ের বন্ধু ছিলেন। কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ লিখেছেন : "১৯২১ সালের শেষাশেষিতে আমরা প্রদেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলব স্থির করেছিলাম। কাজী নজরুল ইসলামও আমাদের এই পরিকল্পনায় ছিল। রুশ বিপ্লবের ওপরে সে যে আগে হতে শ্রদ্ধান্বিত ছিল সে-কথা আমি আগেই বলেছি। আমাদের এই পরিকল্পনা হতেই তার সুবিখ্যাত 'প্রলয়োল্লাস' কবিতা। তার সিন্ধুপারের 'আগলভাঙা' মানে রুশ বিপ্লব।" ১৯৩১ সালের জুন মাসে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন বন্দীরূপে কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং কমিউনিস্ট-দের আদর্শ ও আশু কাজ বিশ্লেষণ করে আদালতে দাঁড়িয়ে 'আমি একজন কমিউনিস্ট' শীর্ষক যে নির্ভীক বিবৃতি দিয়েছিলেন তাতে এক জায়গায় তিনি কাজী নজরুলের নাম উল্লেখ ও লেবার স্বরাজ পার্টি গঠনের ব্যাপারে তাঁর সক্রিয় ভূমিকার কথা বলেছেন। তবে তিনি যে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না সে-কথাও বলেছেন।

কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ সম্পর্কে কাজী নজরুল যে কত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন একটা চিঠিতে তার প্রকাশ দেখা যায়। কাজী নজরুল 'আত্মশক্তি' সম্পাদককে এক চিঠিতে লিখেছেন : "আমি হলফ করে বলতে পারি মুজফ্ফরকে দেখলে লোকের শুষ্ক চক্ষু ফেটেও জল আসবে। এমন সর্বত্যাগী আত্মভোলা মৌনী কর্মী, এমন সুন্দর প্রাণ, এমন ধ্যানীর দূরদৃষ্টি, এমন উজ্জ্বল প্রতিভা—সবচেয়ে এমন উদার বিরাট বিপুল মন নিয়ে সে কি করে জন্মাল গোঁড়া মৌলবীর দেশ নোয়াখালিতে, এই মোল্লা-মৌলবীর দেশ বাঙলায়, তা ভেবে পাইনে!" ......"মুজফ্ফরের মত সমগ্রভাবে নেশনকে ভালবাসতে, ভারতবর্ষকে ভালবাসতে কোন মুসলমান নেতা তো দূরের কথা, হিন্দু নেতাকেও দেখি না।" (৮ই ভাদ্র, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)।

এসব থেকে বুঝা যায় কাজী নজরুল শুধু কবি ছিলেন না; সমাজ বিপ্লবকে রূপায়িত করার ব্যাপারেও তাঁর ভূমিকা ছিল। শ্রমিক, কৃষকের সভায়, মৎসজীবী সম্মেলনে তিনি কবিতা আবৃত্তি ও গান গেয়েছেন। যুব-সম্মেলন ও ছাত্র সম্মেলন সংগঠনে এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে ভলানটিয়ার অধিনায়ক হয়েছেন। সারা বাংলায় রাজনৈতিক সফর করেছেন। ১৯২৩ সালে তাঁর এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড

হয়, এবং মর্যাদার দাবিতে হুগলী জেলে ৩৯ দিন অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ, কমরেড আবদুল হালিম ও ফিলিপ স্প্রাট কুষ্টিয়া কৃষক সম্মেলনে গিয়েছিলেন। এই সম্মেলনে কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে কাজী নজরুলের রাজনৈতিক মঞ্চে শেষ দেখা। ২০শে মার্চ কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘদিন কারাগারে থাকেন। ইতিমধ্যে দেশের রাজনৈতিক জীবনে অনেক ঘটনাস্রোত বয়ে গেছে। কাজী নজরুল ইসলামের জীবনেও পরিবর্তন এসেছে।

বৈশাখের খর রৌদ্রের পরে শ্রাবণের জলধারার মত ত্রিশ দশকে নজরুল কবি মানসে প্রবাহিত হয়ে চলেছে প্রেমসংগীত, পল্লীসংগীত, ধর্মসংগীত, রেডিও, গ্রামোফোন ও ফিল্মের সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে পড়েছেন। রাজনীতি বিচ্ছিন্ন হলেন, কিন্তু সংগীত জগতে বিস্ময়কর প্রতিভা নিয়ে হাজির হলেন। নজরুলের কাব্যসংগীত থেকেই আধুনিক সংগীতের সূচনা। শ্যামাসংগীত ও ইসলামী গানে তিনি একটা নতুন ধারা সৃষ্টি করেছেন। নজরুল সংগীতে সারা বাংলা দেশকে মাতিয়ে তোলেন। বিশ দশকের বিদ্রোহী কবি ত্রিশ দশকে সুরকার রূপে প্রতিষ্ঠা পেলেন। এই অবস্থায় রাজনৈতিক দিক থেকে তাঁর একমাত্র রচনা চীন-ভারত মৈত্রীর গান (১৯৪২)।

১৯৪২ সালের জুলাই মাস থেকে কাজী নজরুল অসুস্থ; নির্বাক, জীবন্মৃত।

দেশের লোক তাঁদের প্রিয় কবিকে ভুলেনি। কাজী নজরুলের প্রতি দেশবাসী অত্যন্ত স্পর্শকাতর। দেশে ন[illegible]রুল কাব্য ও সংগীত অনুশীলন ব্যাপকভাবে চলেছে। বাঙালীর [illegible]ছে নজরুল 'বিদ্রোহী কবি'। তাঁর এত জনপ্রিয়তার কারণ তিনি মুক্তি সংগ্রামে প্রেরণা দিয়েছেন, তিনি নির্যাতিতের পক্ষ গ্রহণ করেছিলেন। এ কথা যেন আমরা ভুলে না যাই।

নজরুলের রচনা থেকে সংকলিত

আমার উপর অভিযোগ, আমি রাজবিদ্রোহী! তাই আমি আজ রাজকারাগারে বন্দী এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত।

একধারে—রাজার মুকুট; আরধারে ধূমকেতুর শিখা।

একজন—রাজা, হাতে রাজদণ্ড; আরজন—সত্য, হাতে ন্যায়দণ্ড।

রাজার পক্ষে—রাজার নিযুক্ত রাজবেতনভোগী রাজকর্মচারী।

আমার পক্ষে—সকল রাজার রাজা, সকল বিচারকের বিচারক, আদি-অনন্তকাল ধরে সত্য—জাগ্রত ভগবান্।...

রাজার পেছনে ক্ষুদ্র, আমার পেছনে রুদ্র। রাজার পক্ষের যিনি, তাঁর লক্ষ্য স্বার্থ, লাভ অর্থ: আমার পক্ষের যিনি তাঁর লক্ষ্য সত্য, লাভ পরমানন্দ।

রাজার বাণী বুদ্বুদ, আমার বাণী সীমাহারা সমুদ্র।

আমি কবি, আমি অপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদানের জন্য ভগবান্ কর্তৃক প্রেরিত। কবির কণ্ঠে ভগবান্ সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সে বাণী রাজবিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায়বিচারে সে বাণী ন্যায়দ্রোহী নয়, সত্যদ্রোহী নয়। সে বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দুয়ারে তাহা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান, অনির্বাণ, সত্যস্বরূপ!...

আমি ভগবানের হাতের বীণা। বীণা ভাঙলেও ভাঙতে পারে, কিন্তু ভগবান্‌কে ভাঙবে কে?...

শুনেছি, আমার বিচারক একজন কবি। শুনে আনন্দিত হয়েছি। বিদ্রোহী কবির বিচার—বিচারক কবির নিকট। কিন্তু বেলাশেষের শেষ-খেয়া এ প্রবীণ বিচারককে হাতছানি দিচ্ছে, আর রক্ত-ঊষার নব-শঙ্খ আমার অনাগত বিপুলতাকে অভ্যর্থনা করছে; তাঁকে ডাকছে মরণ, আমায় ডাকছে জীবন; তাই আমাদের উভয়ের অস্ত-তারা আর উদয়-তারার আলোর মিলন হবে কিনা বলতে পারি না।...

আমার ভয় নাই, দুঃখ নাই; কেননা ভগবান্ আমার সাথে আছেন। আমার অসমাপ্ত কর্তব্য অন্যের দ্বারা সমাপ্ত হবে। সত্যের প্রকাশ পীড়া-

নিরুদ্ধ হবে না। আমার হাতের ধূমকেতু এবার ভগবানের হাতের অগ্নি-মশাল হয়ে অন্যায় অত্যাচারকে দগ্ধ করবে। আমার বহ্নি-এরোপ্লেনের সারথি হবেন এবার স্বয়ং রুদ্র ভগবান। অতএব মাভৈঃ! ভয় নাই। .

প্রেসিডেন্সি জেল, কলিকাতা
৭ জানুআরি ১৯২৩
রবিবার—দুপুর

—জবানবন্দী

১৩২৯ সাল, শ্রাবণ মাস- "তিমির-ভালে অলক্ষণের তিলকরেখা"র মতোই 'ধূমকেতু'-র প্রথম উদয় হয়। তখন নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের সক্রিয় ধূলট উৎসব পুরোমাত্রায় জমিয়া উঠিয়াছে। কারাগারে লোক আর ধরে না, ধরা দিতে গেলে পুলিশ আর ধরে না, 'বন্দে মাতরম্', 'মহাত্মা গান্ধীকী জয়' রব আকাশে বাতাসে আর ধরে না! মার খাইয়া খাইয়া পিঠ শিলা হইয়া গিয়াছে, মারিয়া মারিয়া পুলিশেব হাতে খিল ধরিযা গিয়াছে! মার খাইবার সে কি অদম্য উৎসাহ! পুলিশের পায়ে ধরিলেও সে আর মারে না, পলাইয়া যায়।

ইহারই মাঝে স-প্রমথ প্রলয়েশ ক্ষেপিয়া উঠিলেন। দেশেব নেতা, অপ-নেতা, হবু-নেতা সকলে যখন বড়ো বড়ো দূরবীণ লাগাইয়া স্বরাজের উদয়-তারা খুঁজিতেছিলেন, তখন আমাব উপব শিবঠাকুবের আদেশ হইল—এই আনন্দ রজনীকে শঙ্কাকুল করিয়া তুলিতে। আমাব হাতে তিনি তুলিয়া দিলেন-'ধূমকেতু'ব ভয়াল নিশান। স্ববাজপ্রত্যাশী দল নিন্দা করিলেন, গালি দিলেন। বহু ধূলি উৎক্ষিপ্ত হইল, বহু লোষ্ট্র নিক্ষেপিত হইল। 'ধূমকেতু'কে তাহা স্পর্শ কবিতে পাবিল না।

আমার ভয় ছিল না, আমাব পিছনে ছিলেন বিপুল প্রমথ-বাহিনীসহ দেবাদিদেব প্রলয়-নাথ।

ধূমকেতু
৫ই ভাদ্র ১৩৩৮

ধূমকেতুব আদিউদয়-স্মৃতি

বল বীর—
বল উন্নত মম শিব!
শির নেহারি আমাবি, নত শিব ওই শিখব হিমাদ্রিব!
বল বীর—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তাবা ছাড়ি'

ভূলোক দ্যুলোকে গোলক ছেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ভেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর!
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর!
বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির!

বিদ্রোহী

তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!!
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল-বোশেখীর ঝড়।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!!

আস্‌ছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল,
সিন্ধু-পারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙ্‌ল আগল!
মৃত্যু-গহন অন্ধকূপে
মহাকালের চণ্ডরূপে—
বজ্র-শিখার মশাল জেব্লে আস্‌ছে ভয়ংকর!
ওরে ওই হাস্‌ছে ভয়ংকর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
তোরা সব জয়ধ্বনি কব্!!

প্রলয়োল্লাস

হার মেনেছ বিদ্রোহীকে বাঁধ্‌তে তুমি পারবে না।
তোমার সর্বশক্তি আমায়, বাঁধ্‌তে গিয়ে
হার মেনে যায়!
হায় হাসি পায়, হেরেও তুমি হারবে না?
হেরে গেলে! বিদ্রোহীকে বাঁধ্‌তে তুমি পারবে না।
… … …

ধরতে আমায় জাল পেতেছে জটিল তোমার সাত আকাশ
সে জাল ছিঁড়ে এ ধূমকেতু
বিনাশ করে বাঁধার সেতু
সপ্তস্বর্গ পাতাল ঘিরে ভস্ম করে সকল বিঘ্ন সর্বনাশ।

চিরবিদ্রোহী

বন্ধু গো আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা এই বুকে,
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে,
রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা,
বড়ো কথা বড়ো ভাব আসে নাক মাথায়, বন্ধু বড়ো দুখে!
অমর-কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে!
... ...
প্রার্থনা করো—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটী মুখের গ্রাস
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ!

আমার কৈফিয়ৎ

ঐ দিকে দিকে বেজেছে ডঙ্কা, শঙ্কা নাহিক আর!
'মরিয়া'র মুখে মারণের বাণী উঠিতেছে মার মার!
রক্ত যা ছিল করেছে শোষণ,
নীরক্ত দেহে হাড় দিয়ে রণ—
শতশতাব্দী ভাঙেনি যে হাড়, সেই হাড়ে ওঠে গান—
'জয় নিপীড়িত জনগণ জয়! জয় নব উত্থান!
জয় জয় ভগবান!

ফরিয়াদ

আমরা মূর্খ বলিয়া বুদ্ধিমান করে প্রতারণা;
দেখেছি নিজের শক্তিকে, আর লাঞ্ছনা সহিব না!
যে হাত হাতুড়ি দিয়া গড়িয়াছি প্রাসাদ হর্ম-রাজি,
সেই হাত দিয়া বিলাস-কুঞ্জ ধ্বংস করিব আজি।

দেয় নাই ওরা পারিশ্রমিক মজুরের শ্রমিকের—
যা দিয়েছে, তাহে মেটেনি মোদের ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্ষণিকের!
মোদের প্রাপ্য আদায় করিব, কব্জি শক্ত কর;
গড়ার হাতুড়ি ধরেছি, এবার ভাঙার হাতুড়ি ধর!

শ্রমিক-মজুর

আমরা গরীব, মোরা শতকরা নিরানব্বই জন,
আমরা সংঘবন্ধ হইব করিয়া পরাণ-পণ।
লোভী রাক্ষস ভোগীদের সংহার করি' পৃথিবীতে
পূর্ণ সাম্য আনিব, দানিব অমৃত বঞ্চিতে।
ধরার সকল মানুষ দুবেলা অন্ন পাইবে পাতে,
নগ্ন শরীরে বস্ত্র পাইবে, অস্ত্র পাইবে হাতে।
বিনা ঔষধে পথ্য না পেয়ে ছেলেমেয়ে মরিবে না,
শিক্ষা পাইবে, দীক্ষা পাইবে, দাসত্ব করিবে না।
বৃষ্টির জল ঝরিবে না ঘরে ফুটো খোড়ো চাল বেয়ে,
সন্তোষ লাভ করিবে সকলে সমান অংশ পেয়ে।

দরিদ্র মোর পরমাত্মীয়

সাম্যের গান গাই
যেখানে আসিয়া সম-বেদনায় সকলে হয়েছি ভাই।
এ প্রশ্ন অতি সোজা
এক ধরণীর সন্তান, কেন কেউ রাজা, কেউ প্রজা?

রাজা-প্রজা (সাম্যবাদী)

রবে না দরিদ্র, রবে না অসাম্য,
সমান অন্ন পাবে নাগরিক গ্রাম্য,
রবে না বাদশা রাজা জমিদার মহাজন,
কারো বাড়ী উৎসব কারো বাড়ী অনশন,
কারো অট্টালিকা কারো খড়হীন ছাদ,
রবে না এ ভেদ, সব ভেদ হবে বরবাদ!

নির্যাতিত ধরা মধুর সুন্দর প্রেমময় হোক!
জয় হোক, আল্লার জয় হোক!
সাম্যের জয় হোক! শান্তির জয় হোক!
সত্যের জয় হোক! জয় হোক, জয় হোক!

জয় হোক! জয় হোক!

হায় রে ভারত, হায়, যৌবন তাহার
দাসত্ব করিতেছে অতীত জরার!
জরাগ্রস্ত বুদ্ধিজীবী বৃদ্ধ জরদ্গব
দেখায়ে গলিত মাংস চাকুরীর মোহ
যৌবনের টিকা-পরা তরুণের দলে
আনিয়াছে একেবারে ভাগাড়ে শ্মশানে
যৌবনে বাহন করি পঙ্গু জরা আজি
হইয়াছে ভারতের জন-গণ-পতি!
যে হাতে পাইত শোভা খর তরবারি
সেই তরুণের হাতে ভোট-ভিক্ষা-ঝুলি
বাঁধিয়া দিয়াছে হায়!—রাজনীতি ইহা!
পলায়ে এসেছি আমি লজ্জায় দু'হাতে
নয়ন ঢাকিয়া! যৌবনের এ লাঞ্ছনা
দেখিবার আগে কেন মৃত্যু হইল না?

শিখা

আমার ভারত এ-মানচিত্রের ভারতবর্ষ নয় রে আনিম! আমি তোমাদের চেয়ে কম ভাবপ্রবণ নই, তবু আমি শুধু ভারতের জল-বায়ু-মাটি-পর্বত-অরণ্যকেই ভালবাসি নি! আমার ভারতবর্ষ—ভারতের এই মূক-দরিদ্র—নিরন্ন-পরপদদলিত তেত্রিশ কোটি মানুষের ভারতবর্ষ! আমার ভারতবর্ষ ইন্ডিয়া নয়, হিন্দুস্থান নয়, গাছপালার ভারতবর্ষ নয়, —আমার ভারতবর্ষ মানুষের যুগে-যুগে-পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দন-তীর্থ। কত অশ্রুসাগরে চড়া পড়ে পড়ে উঠল আমার এই বেদনার ভারতবর্ষ। ওরে, এ ভারতবর্ষ তোদের মন্দিরের ভারতবর্ষ নয়, মুসলমানের মসজিদের ভারতবর্ষ নয়,—এ আমার মানুষের—মহা-মানুষের মহাভারত!

কুহেলিকা

এস ভাই হিন্দু! এস মুসলমান! এস বুদ্ধ! এস ক্রিশ্চিয়ান! আজ আমরা সব গণ্ডি কাটাইয়া সব সঙ্কীর্ণতা সব মিথ্যা সর্ব স্বার্থ চিরতরে পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া ভাইকে ভাই বলিয়া ডাকি। আজ আমরা আর কলহ করিব না। চাহিয়া দেখ, পাশে তোমাদের মহাশয়নে শায়িত ঐ বীর ভ্রাতৃগণের শব। ঐ গোরস্থান—ঐ শ্মশানভূমিতে—শোন শোন তাহাদের তরুণ আত্মার অতৃপ্ত ক্রন্দন। এ পবিত্র স্থানে আজ স্বার্থের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দাও ভাই। ঐ শহীদ ভাইদের মুখ মনে কর, আর গভীর বেদনায় মূক স্তব্ধ হইয়া যাও! মনে কর, তোমাকে মুক্তি দিতেই যে এমন করিয়া অসময়ে বিদায় লইয়াছে। উহার সে ত্যাগের অপমান করিয়ো না, ভুলিয়ো না!

নবযুগ/যুগবাণী

আমাদের এই পতিত, চণ্ডাল ছোটোলোক ভাইদের বুকে করিয়া তাহাদিগকে আপন করিয়া লইতে, তাহাদেরই মত দীন বসন পরিয়া, তাহাদের প্রাণে তোমরাও প্রাণ সংযোগ করিয়া, উচ্চশিরে ভারতের বুকে আসিয়া দাঁড়াও, দেখিবে বিশ্ব তোমাকে নমস্কার করিবে।

উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন/যুগবাণী

মোরা একবৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।
মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ॥
এক সে আকাশ মায়ের কোলে
যেন রবি শশী দোলে,
এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ীর টান॥

সুর-সাকী

দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুঁসিয়ার!

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?

কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ—
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।

কাণ্ডারী হুঁসিয়ার

এ-কথা স্বীকার করতে আজ আমার লজ্জা নেই যে, আমি শক্তি-সুন্দর রূপ-সুন্দরকে ছাড়িয়ে আজো উঠতে পারি নি। সুন্দরের ধেয়ানী দুলাল কীটসের মত আমারও মন্ত্র—"Beauty is truth, truth is beauty."

আমি যেটুকু দান করেছি, তাতে কার কতটুকু ক্ষুধা মিটেছে জানিনে; কিন্তু আমি জানি, আমাকে পরিপূর্ণরূপে আজো দিতে পারি নি, আমার দেবার ক্ষুধা আজও মেটে নি। যে উচ্চ গিরি-শিখরের পলাতকা সাগর-সন্ধানী জলস্রোত আমি, সেই গিরি-শিখরের মহিমাকে যেন খর্ব না করি! যেন মরুপথে পথ না হারাই!

আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখি নি, তাঁর চোখে চোখ-ভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্থানের পথে, তাঁকে ক্ষুধা-দীর্ণ মূর্তিতে, ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধ-ভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধকূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে-রূপে অপরূপ করে দেখার স্তব-স্তুতি।

১৫ই ডিসেম্বর ১৯১৯ **অভিনন্দনের উত্তর**

জাগো জনশক্তি! হে আমার অবহেলিত পদপিষ্ট কৃষক, আমার মুটে-মজুর ভাইরা! তোমার হাতের ঐ লাঙল আজ বলরাম-স্কন্ধে হলের মত ক্ষিপ্ত তেজে গগনের মাঝে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠুক, এই অত্যাচারীর বিশ্ব উপড়ে ফেলুক—উলটে ফেলুক! আনো তোমার হাতুড়ি, ভাঙো ঐ উৎপীড়কের প্রাসাদ—ধূলায় লুটাও অর্থ-পিশাচ বলদর্পীর শির। ছোড়ো হাতুড়ি, চালাও লাঙল, উচ্চে তুলে ধরো তোমার বুকের রক্ত-মাখা লালে লাল ঝাণ্ডা!

রুদ্রমঙ্গল : রুদ্রমঙ্গল

অন্যদের চোখে নজরুল

কাজী নজরুল ইস্‌লাম কল্যাণীয়েষু,—
আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ্‌ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন!
অলক্ষণের তিলকরেখা
রাতের ভালে হোক্‌ না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে'
আছে যারা অর্ধচেতন!

২৪শে শ্রাবণ ১৩২৯ **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

Give up hunger strike, our literature claims you.

দৈনিক বসুমতী
১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ **Rabindranath**

...একজন সত্যকার কবি। রবিবাবু ছাড়া বোধহয় এখন কেহ আর এত বড়ো কবি নাই।

২৪শে শ্রাবণ ১৩২৯ **শরৎচন্দ্র**

...আধুনিক সাহিত্যে মাত্র দু'জন কবির মধ্যে আমরা সত্যিকার মৌলিকতার সন্ধান পেয়েছি। তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল। নজরুল কবি—প্রতিভাবান মৌলিক কবি। রবীন্দ্রনাথের আওতায় নজরুলের প্রতিভা পরিপুষ্ট হয় নি। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কবি বলে স্বীকার করেছেন। আজ আমি এই ভেবে আনন্দলাভ করছি যে, নজরুল ইস্‌লাম

শুধু মুসলমানের কবি নন, তিনি বাঙলার কবি, বাঙালীর কবি। কবি মাইকেল মধুসূদন খ্রীস্টান ছিলেন। কিন্তু বাঙালী জাতি তাঁকে শুধু বাঙালীরূপেই পেয়েছিল। আজ নজরুল ইস্‌লামকেও জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। কবিরা সাধারণত কোমল ও ভীরু, কিন্তু নজরুল তা নন। কারাগারে শৃঙ্খল পরে বুকের রক্ত দিয়ে তিনি যা লিখেছেন, তা বাঙালীর প্রাণে এক নূতন স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে।

বক্তৃতাংশ
১৫ই ডিসেম্বর
১৯১৯

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

এঁর কবিতার সাথে পরিচিত হয়ে দেখলাম—এ-তো কম নয়। এ খাঁটি মাটি থেকে উঠে এসেছে। আগেকার কবি যাঁরা ছিলেন, তাঁরা দোতলা প্রাসাদে থেকে কবিতা লিখতেন।...নজরুল ইস্‌লাম কোথায় জন্মেছেন জানি না; কিন্তু তাঁর কবিতায় গ্রামের ছন্দ, মাটির গন্ধ পাই। দেশে যে নূতন ভাব জন্মেছে তার সুর তা-ই। তাতে পালিশ বেশী নেই, আছে লাঙ্গলের গান, কৃষকের গান।...মানুষের একান্তসাধন। এ অতি অল্প লোকই করেছে। কাজী নজরুল ইস্‌লাম নূতন যুগের কবি।... জাতির প্রাণে লাঙ্গল এসেছে, নূতন ডিমোক্র্যাট নজরুলের বীণার ঝংকারে তা পাই।

বক্তৃতাংশ
কল্লোল
জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬

বিপিনচন্দ্র পাল

স্বাধীন দেশে জীবনের সাথে সাহিত্যের স্পষ্ট সম্বন্ধ আছে। আমাদের দেশে তা নেই।...নজরুলে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়! নজরুল জীবনের নানা দিক থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, তার মধ্যে একটা আমি উল্লেখ করব। কবি নজরুল যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কবি নিজে বন্দুক ঘাড়ে করে যুদ্ধে গিয়েছিলেন, কাজেই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সব কথা লিখেছেন। আমাদের দেশে ঐরূপ ঘটনা কম, —অন্য স্বাধীন দেশে খুব বেশী। এতেই বুঝা যায় যে নজরুল একটা জীয়ন্ত মানুষ।

কারাগারে আমরা অনেকে যাই, কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেই জেল-

জীবনের প্রভাব কমই দেখতে পাই। তার কারণ অনুভূতি কম। কিন্তু নজরুল যে জেলে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে অনেক স্থানে পাওয়া যায়। এতেও বোঝা যায় যে, তিনি একটি জ্যান্ত মানুষ।

তাঁর লেখার প্রভাব অসাধারণ। তাঁর গান পড়ে আমার মত বেরসিক লোকেরও জেলে বসে গাইবার ইচ্ছা হত। আমাদের প্রাণ নেই, তাই আমরা এমন প্রাণময় কবিতা লিখতে পারি না।

নজরুলকে 'বিদ্রোহী' কবি বলা হয় এটা সত্য কথা। তাঁর অন্তরটা যে বিদ্রোহী, তা স্পষ্টই বোঝা যায়। আমরা যখন যুদ্ধে যাব—তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব, তখনও তাঁর গান গাইব।

আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্বদাই ঘুরে বেড়াই। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয় সংগীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'-র মত প্রাণমাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না।

কবি নজরুল যে-স্বপ্ন দেখেছেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয়—সমগ্র বাঙালী জাতির স্বপ্ন।

বক্তৃতাংশ
১৫ই ডিসেম্বর
১৯১৯

সুভাষচন্দ্র বসু

নজরুলের বিদ্রোহ ও বে-হিসাবী যৌবনশক্তি শুধু যে তাঁর কাব্যেই রূপায়িত হয়েছিল, তাই নয়, তাঁর জীবনেও পরিপূর্ণভাবে তা ফুটে উঠেছিল। সাবধানী পথিকের মত পা ফেলে চলা তাঁর স্বভাবে ছিল না, তাই সে করেছে যখন চেয়েছে মন যা। কিন্তু তাঁর মন তো শয়তানের আবাস ছিল না। তাঁর মন ছিল সকলের জন্যে প্রীতি, স্নেহ ও ভালবাসায় ভরপুর। সেই মনের খুশী মেটাতে অগ্রপশ্চাৎ দেখেন নি তিনি কোনোদিন। অনেকে বলেন, তার জন্যে জীবনে অনেকখানি মূল্য দিতে হয়েছে তাঁকে। বন্ধু ঠকিয়েছে জেনেও সেই বন্ধুর কথায় আবার বিশ্বাস করেছেন, ঠেকে শেখেন নি কোনোদিন। বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তিনি এ বিশ্বাস কোনদিন হারান নি যে, মানুষ মাত্রেই সৎ, অবস্থার বিপাকে পড়ে সাময়িকভাবে যতখানি নীচতাই সে প্রকাশ করুক-না কেন!

পরিচয়
জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

নজরুলের সঙ্গে আলাপ জমে গেল। সে কবিতা পড়লো, গান শোনালে। আমিও তাকে গান শোনালুম। কি ভালই লেগেছিল নজরুলকে সেই প্রথম আলাপে! সবল শরীর; ঝাকড়া চুল, চোখ দুটি যেন পেয়ালা, কখনো সে পেয়ালা খালি নেই, প্রাণের অরুণ রসে সদাই ভরপুর। গলাটি সারসের মতো পাতলা নয়, পুরুষের গলা যেমন হওয়া উচিত তেমনি সবল, বীর্য-ব্যঞ্জক। গলার স্বরটি ছিল ভারী, গলায় যে সুর খেলত তা বলতে পারি নে, কিন্তু সেই মোটা গলার সুরে ছিল যাদু। ঢেউয়ের আঘাতের মতো, ঝড়ের ঝাপটার মতো তার গান আছড়ে পড়ত শ্রোতার বুকে। অনেক চিকন গলার গাইয়ের চেয়ে নজরুলের মোটা গলার গান আমার লক্ষগুণ ভালো লাগল।...প্রবল হতে সে ভয় পেত না, নিজেকে মিঠে দেখাবার জন্যে সে কখনো চেষ্টা করত না। রবীন্দ্রনাথের পরে এমন শক্তিশালী কবি আর আসে নি বাঙলা দেশে। এমন সহজ গতি, আবেগের আগুন-ভরা কবিতা বাঙলা সাহিত্যে বিরল।

যাত্রী : প্রথম খণ্ড
পৌষ ১৩৫৭

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাহিত্যে নজরুল, সংগীতে নজরুল, সভা-সমিতিতে নজরুল, আড্ডা-মজলিসে নজরুল, দেশব্যাপী বন্দনায় নজরুল, দ্বেষদুষ্ট লাঞ্ছনায় নজরুল, দাবা খেলায় আত্মভোলা নজরুল, ফুটবল মাঠে আত্মসচেতন নজরুল; রঙ্গরসে নজরুল, ব্যঙ্গবিদ্রূপে নজরুল; যোগী নজরুল, ভোগী নজরুল; হস্তরেখা-পাঠে অধ্যবসায়ী নজরুল, 'কলগীতি'পাটে অধ্যবসায়ী নজরুল;—কোথায় কিসে নাই নজরুল? কিন্তু এই ছোটো ছোটো টুকরোগুলো জোড়া দিলে যে সম্পূর্ণ আকার রূপ পরিগ্রহ করে, সেই নজরুল-মানুষটি এ-সবের সমষ্টির চেয়ে আরও বড়ো। যাঁরা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন, তাঁরাই এ সত্য উপলব্ধি করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর কোলে নজরুল যেন ঊনবিংশ শতাব্দীর বিদায়-কালীন প্রীতি-উপহার।

শ্রদ্ধাস্পদেষু

নলিনীকান্ত সরকার

...অন্তরের গোপনতম প্রদেশে তিনি তাত্ত্বিক আর সেই তাত্ত্বিকতা তাঁর যেন জন্মগত। তাঁর এই পরম প্রিয় তত্ত্বের নাম দেওয়া যেতে পারে লীলাবাদ—ইংরেজিতে যা সাধারণত Pantheism নামে পরিচিত।

এই দৃষ্টিতে ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, জন্ম-মৃত্যু, উত্থান-পতন, সব কিছুই ভগবানের লীলা। এই তত্ত্বকে বলা যায় একই সঙ্গে অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। হিন্দুচিন্তার এটি যে মর্মকথা তা না বললেও চলে, সুফী চিন্তারও এটি মর্মকথা—...নজরুল যে অবলীলাক্রমে শ্যামা-সঙ্গীত ও বৃন্দাবন-গাথা রচনা করে চলেছেন, তৌহীদেরও (একেশ্বর তত্ত্ব) শক্তিশালী ব্যাখ্যা দিতে পারছেন, তার রহস্য নিহিত রয়েছে তাঁর এই মূল বিশ্বাসের ভিতরে।

এই লীলাবাদ তাঁর জন্যে এক ধরনের আত্ম-বিস্মৃতি এনে দিয়েছে, তাঁকে আশ্চর্যভাবে নিরহংকার ও সৌন্দর্য-পিপাসু করেছে।...

শাশ্বত বঙ্গ **কাজী আবদুল ওদুদ**

দেহের পাত্র ছাপিয়ে সব সময়েই উছলে পড়েছে তাঁর প্রাণ, কাছাকাছি সকলকেই উজ্জীবিত করে, মনের যত ময়লা, যত খেদ, যত গ্লানি সব ভাসিয়ে দিয়ে। সকল লোকই তাঁর আপন, সব বাড়িই তাঁর নিজের বাড়ি। শ্রীকৃষ্ণের মতো, তিনি যখন যার—তখন তার। জোর করে একবার ধরে আনতে পারলে নিশ্চিন্ত, আর ওঠবার নাম করবেন না—বড়ো-বড়ো জরুরি এনগেজমেন্ট ভেসে যাবে।...

হয়তো দু'দিনের জন্যে কলকাতার বাইরে কোথাও গান গাইতে গিয়ে সেখানেই একমাস কাটিয়ে এলেন। সাংসারিক দিক থেকে এ-চরিত্র আদর্শ নয়, কিন্তু এ-চরিত্রে রম্যতা আছে তাতে সন্দেহ কী। সেকালে বোহে-মিয়ান চাল-চলন অনেকেই রপ্ত করেছিলেন—মনে-মনে তাঁদের হিসাবের খাতায় ভুল ছিল না—জাত-বোহেমিয়ান এক নজরুল ইস্‌লামকেই দেখেছি। অপরূপ তাঁর দায়িত্বহীনতা।

কবিতা
কার্তিক-পৌষ ১৩৫১ **বুদ্ধদেব বসু**

সপ্তাহান্তে বিকেলবেলা আরো অনেকের সঙ্গে জগুবাবুর বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকি, হকার কতক্ষণে 'ধূমকেতু'-র বান্ডিল নিয়ে আসে। হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কাগজের জন্যে। কালির বদলে রক্তে ডুবিয়ে ডুবিয়ে লেখা সেই সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। সঙ্গে "ত্রিশূলে"র আলোচনা। শুনেছি স্বদেশী যুগের "সন্ধ্যা"তে ব্রহ্মবান্ধব এমনি

ভাষাতেই লিখতেন। সে কী কশা, কী দাহ! একবার পড়ে বা শুধু একজনকে পড়িয়ে শান্ত করবার মত সে লেখা নয়। যেমন গদ্য তেমনি কবিতা। সব ভাঙার গান, প্রলয়-বিলয়ের মঙ্গলাচরণ।

কল্লোল যুগ — অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নজরুলের প্রতিভার বৈশিষ্ট্য বুঝতে হলে, তার প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদা দিতে হলে, আমাদের সর্বপ্রথম মনে রাখতে হবে সেই কথাকে, নজরুল জন্মেছিল রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী ও সর্বব্যাপী নিশ্ছিদ্র প্রতিভার পূর্ণপ্রভাবের যুগে এবং সে যুগের প্রত্যেক তরুণ সাহিত্য-প্রয়াসীর মত সে আকণ্ঠ পান করেছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সুধা। শুধু তাই নয়, সর্বাঙ্গ ভাসিয়ে সে ডুব দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের গানে আর রবীন্দ্রনাথের সুরের গভীরে, তেমন করে রবীন্দ্রনাথের আলোয় সমস্ত চেতনাকে রাঙিয়ে তুলতে আজকের যুগের তরুণদের দেখি না। কিন্তু নজরুল-প্রতিভার অনন্যসাধারণত্ব ও স্বাতন্ত্র্য হলো, যখন সে কবিতা লিখল, যখন সে নিজে গান রচনা করল, সুর সৃষ্টি করল, তখন তার কবিতার একটা অক্ষরের মধ্যে, তার গানের একটা আন্দোলনের মধ্যে, তার সুরের একটা দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে, তার প্রকাশের ক্ষীণতম ভঙ্গীর মধ্যে, এমন-কি তার ভাষার রীতির মধ্যে কোথাও দেখা গেল না রবীন্দ্র-প্রতিভার বিন্দুমাত্র প্রভাবের লক্ষণ।...এ যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে, সংগীত রচয়িতাদের মধ্যে, সুর-স্রষ্টাদের মধ্যে একমাত্র নজরুলই অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে পেরিয়ে গিয়েছে রবীন্দ্র-প্রভাবের মন্ত্রপূত গণ্ডী। মানুষের মস্তিষ্কের সকল চেষ্টার বাইরে, যে রহস্যময় শক্তি দৈবধনের মত শুধু দু'একটি চিহ্নিত ভাগ্যবানকে দেয় তার নিগূঢ় রহস্য মন্ত্রের দুর্লভ দীক্ষা, নজরুল এ যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে পেয়েছিল সেই রহস্যময় দুর্লভ শক্তির প্রসাদ, যার কৃপায় সে হয়ে উঠেছিল অনন্য-সাধারণ, স্বতন্ত্র, একক। অনেক ভালো কবির মধ্যে, নজরুল শুধু একজন ভালো কবি নয়, অনেক ভালো গায়কের মধ্যে নজরুল শুধু একজন ভালো গায়ক নয়, অনেক ভালো সুরকারের মধ্যে নজরুল শুধু একজন ভালো সুরকার নয়; বাংলা কাব্যসাহিত্যে, বাংলার সংগীতে, বাংলার সুর-সৃজন-লোকে নজরুলের নেই কোনো পিতৃপুরুষ, নেই কোনো উত্তরাধি-কারী। সে দাঁড়িয়ে আছে স্বতন্ত্র, একক, একটা সম্পূর্ণ নতুন ব্যক্তিত্ব ও শক্তি।

প্রাণ-সুন্দর
বিপ্লবী-কবি নজরুল — নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

নজরুল-গ্রন্থপঞ্জী

কবিতা

(১) অগ্নিবীণা ॥ প্রথম প্রকাশ—কার্তিক, ১৩২৯ সাল (১৯২২)। সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। দ্বিতীয় সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৩০ সাল (১৯২৩)।

(২) দোলন-চাঁপা ॥ প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৩০ সাল (১৯২৩)।

(৩) বিষের বাঁশী ॥ প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল (১৯২৪)। সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। দ্বিতীয মুদ্রণ শ্রাবণ, ১৩৫২ সাল (১৯৪৫)।

(৪) ভাঙার গান ॥ প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল (১৯২৪)। সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ—১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ।

(৫) ছায়ানট ॥ গ্রন্থে প্রকাশকাল নেই। সম্ভবত প্রথম প্রকাশ—১৩৩২ সাল (১৯২৫)।

(৬) পূবের হাওয়া ॥ প্রথম প্রকাশ-আশ্বিন, ১৩৩২ সাল (১৯২৫)।

(৭) সাম্যবাদী ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৩২ সাল (ডিসেম্বর, ১৯২৫)।

(৮) চিত্তনামা ॥ প্রথম প্রকাশ-সম্ভবত শ্রাবণ, ১৩৩২ সাল (১৯২৫)।

(৯) সর্বহারা ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৩৩ সাল (১৯২৬)।

(১০) ফণি-মনসা ॥ প্রথম প্রকাশ -শ্রাবণ, ১৩৩৪ সাল (১৯২৭)।

(১১) সিন্ধু-হিল্লোল ॥ গ্রন্থে প্রকাশকাল নেই। সম্ভবত প্রথম প্রকাশ—১৩৩৪ সাল (১৯২৭)।

(১২) জিঞ্জীব ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৩৫ সাল (১৯২৮)।

(১৩) সঞ্চিতা ॥ প্রথম প্রকাশ- ১৩৩৫ সাল (১৯২৮)। 'অগ্নিবীণা', 'ঝিঙেফুল', 'সর্বহাবা', 'ফণি-মনসা', 'ছায়ানট', 'দোলন-চাঁপা', 'সিন্ধু-হিল্লোল' ও 'চিত্তনামা' কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে কবিতা বাছাই করে বর্মন পাবলিশিং হাউস প্রথমে 'সঞ্চিতা'র একটি সংস্করণ বের কবেন (২রা অক্টোবর, ১৯২৮)। ঐ বৎসরের ১৪ই অক্টোবর তারিখে ডি এম. লাইব্রেরী কর্তৃক 'সঞ্চিতা'র

যে অপর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাতে উক্ত কাব্য-গ্রন্থগুলি ছাড়াও 'জিঞ্জীর' ও 'বুলবুল' কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতা স্থান পায়। এই সংস্করণটিই এখন বাজারে চলছে এবং এতে অন্য কয়েকটি গ্রন্থের কবিতা সংযুক্ত হয়েছে।

(১৪) চক্রবাক ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৩৬ সাল (১৯২৯)।
(১৫) সন্ধ্যা ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৩৬ সাল (১৯২৯)।
(১৬) প্রলয়-শিখা ॥ প্রথম প্রকাশ—১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ। সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। দ্বিতীয় সংস্করণ—ভাদ্র, ১৩৫৬ সাল (১৯৪৯)।
(১৭) নতুন চাঁদ ॥ প্রথম প্রকাশ—১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ।
(১৮) সঞ্চয়ন ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৬২ সাল (১৯৫৫)।
(১৯) মরু-ভাস্কর ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৬৪ সাল (১৯৫৭)।
(২০) শেষ সওগাত ॥ প্রথম প্রকাশ- ২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৫ সাল (১৯৫৮)।
(২১) ঝড় ॥ প্রথম প্রকাশ—১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭ সাল (১৯৬০)।

কাব্যগ্রন্থের অনুবাদ

(১) রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ ॥ প্রথম প্রকাশ—১লা আষাঢ়, ১৩৩৭ সাল (১৯৩০)।
(২) কাব্য আমপারা ॥ প্রথম প্রকাশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০ সাল (১৯৩৩)।
(৩) রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম ॥ প্রথম প্রকাশ—১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ।

ছোটদের কবিতা

(১) ঝিঙেফুল ॥ গ্রন্থে প্রকাশকাল নেই। সম্ভবত প্রথম প্রকাশ—১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ।
(২) সাতভাই চম্পা ॥ প্রকাশকাল জানা যায় নাই।

উপন্যাস

(১) বাঁধনহারা ॥ প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৩৪ সাল (১৯২৭)।
(২) মৃত্যু-ক্ষুধা ॥ প্রথম প্রকাশ—ফাল্গুন, ১৩৩৬ সাল (১৯৩০)।
(৩) কুহেলিকা ॥ প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ; ১৩৩৮ সাল (জুলাই, ১৯৩১)।

গল্প

(১) ব্যথার দান ॥ প্রথম প্রকাশ—ফাল্গুন, ১৩২৮ সাল (১৯২২)।
(২) রিক্তের বেদন ॥ প্রথম প্রকাশ—১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ।
(৩) শিউলি-মালা ॥ প্রথম প্রকাশ—অক্টোবর, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ।

নাটক

(১) ঝিলিমিলি ॥ প্রথম প্রকাশ—নভেম্বর, ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ।
(২) আলেয়া ॥ গ্রন্থে প্রকাশকাল নেই। সম্ভবত প্রথম প্রকাশ—১৩৩৮ সাল (১৯৩১)।
(৩) মধুমালা ॥ প্রথম প্রকাশ—১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ।

ছোটদের নাটক

(১) পুতুলের বিয়ে ॥ গ্রন্থে প্রকাশকাল লেখা নেই।

প্রবন্ধ

(১) যুগবাণী ॥ প্রথম প্রকাশ—১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ। সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। দ্বিতীয় সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬ সাল (১৯৪৯)।
(২) রাজবন্দীর জবানবন্দী ॥ প্রথম প্রকাশ—১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ।
(৩) রুদ্রমঙ্গল ॥ গ্রন্থে প্রকাশকাল নেই।
(৪) দুর্দিনের যাত্রী ॥ গ্রন্থে প্রকাশকাল নেই। সম্ভবত প্রথম প্রকাশ—১৩৩৩ সাল (১৯২৬)।
(৫) ধূমকেতু ॥ প্রথম প্রকাশ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭ সাল (১৯৬০)।

সম্পাদিত পত্রিকা

(১) নবযুগ ॥ প্রথম প্রকাশ—১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি।
(২) ধূমকেতু ॥ প্রথম প্রকাশ—১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই আগস্ট।

পরিচালিত পত্রিকা

(১) লাঙল ॥ প্রথম প্রকাশ—২৫শে ডিসেম্বর, ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ। সাপ্তাহিক 'লাঙল'-এর কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর

তার নাম পরিবর্তন করে 'গণবাণী' রাখা হয়। 'গণবাণী'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট তারিখে।

সংগীত-গ্রন্থাবলী

(১) বুলবুল (প্রথম খন্ড) ॥ প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৩৫ সাল (১৯২৮)।

(২) চোখের চাতক ॥ প্রথম প্রকাশ—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ সাল (১৯২৯)।

(৩) চন্দ্রবিন্দু ॥ প্রথম সংস্করণ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত। দ্বিতীয় মুদ্রণ—ফাল্গুন, ১৩৫২ সাল (১৯৪৬)।

(৪) নজরুল-গীতিকা ॥ প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র, ১৩৩৭ সাল (১৯৩০)।

(৫) নজরুল-স্বরলিপি ॥ প্রথম প্রকাশ—শ্রাবণ, ১৩৩৮ সাল (১৯৩১)।

(৬) সুরসাকী ॥ প্রথম প্রকাশ—আষাঢ়, ১৩৩৮ সাল (১৯৩১)।

(৭) জুলফিকার ॥ প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র, ১৩৩৯ সাল (১৯৩২)।

(৮) বন-গীতি ॥ প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৩৯ সাল (১৯৩২)।

(৯) গুলবাগিচা ॥ প্রথম প্রকাশ—১৩৪০ সাল (১৯৩৩)।

(১০) গীতি-শতদল ॥ প্রথম প্রকাশ—বৈশাখ, ১৩৪১ সাল (১৯৩৪)।

(১১) সুরলিপি ॥ গ্রন্থে প্রকাশকাল নেই। সম্ভবত প্রথম প্রকাশ—১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ।

(১২) সুর-মুকুর ॥ প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৪১ সাল (১৯৩৪)।

(১৩) গানের মালা ॥ প্রথম প্রকাশ—অক্টোবর, ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ।

(১৪) বুলবুল (দ্বিতীয় খন্ড) ॥ প্রথম প্রকাশ ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯ সাল (১৯৫২)।

[ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্তের 'নজরুল-চরিতমানস' (প্রথম ভারতী সংস্করণ) গ্রন্থ থেকে নজরুল-গ্রন্থপঞ্জীটি উদ্ধৃত।]

নজরুল-জন্মজয়ন্তী-উৎসব উপদেষ্টা-সমিতি

১। শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়
২। শ্রীমন্মথ রায়
৩। শ্রীসুধী প্রধান
৪। শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়
৫। কাজী অনিরুদ্ধ
৬। শ্রীচিন্ময় চট্টোপাধ্যায়
৭। শ্রীমতী সুপ্রভা সরকার
৮। শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্ত
৯। শ্রীকল্পতরু সেনগুপ্ত (আহ্বায়ক)
১০। ডক্টর অমিয়কুমার সেন
১১। শ্রীনীতীশচন্দ্র বাগচি